ইতিহাস পরিচয়

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI
Vide Notification No. T. B. No. VI/H/79/94 Dated 5.12.79

ইতিহাস পরিচয়

[ষষ্ঠ শ্রেণী]

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ কুমার এম. এ., বি. টি.
(ডিপ্লোমা ইন বেসিক এডুকেশন) ডবলিউ· বি· ই· এস্· (অ)
ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (ভারত সরকার),
মুর্শিদাবাদ
বারাসাত গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল, টাকী গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল ও
আড়াইডাঙ্গা ডি· বি· এম· অ্যাকাডেমী প্রভৃতি উচ্চ
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক।
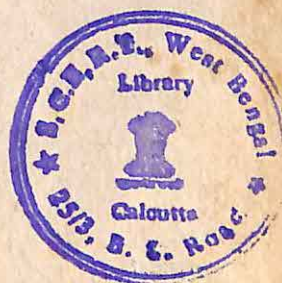
রুমা পাবলিকেশন
১৫এ, টেমার লেন •••• কলিকাতা-৯।

প্রকাশক :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর অধিকারী
১৫এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৭৯
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৮১

মূল্য : পাঁচ টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীরাধারমণ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস
৭৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ

ইতিহাস ও মানব সভ্যতা ... ১

প্রাচীন মানুষের কথা জানার উপায়

[নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন — প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন— প্রাচীন চিত্র ও লিপি—স্তম্ভ, শিলালিপি, মুদ্রা—ধর্মগ্রন্থ—পর্যটক, ভ্রমণকারীদের বিবরণ] ... ২—৪

অনুশীলনী ... ৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

আদিম মানুষ ... ৫

পুরা প্রস্তর যুগ ... ৬

নব প্রস্তর যুগ ... ৭

নব প্রস্তর যুগের বিপ্লব

[পশুপালন—মাটির তৈজস পত্র—বস্ত্রবয়ন—আবাসগৃহ—যোগাযোগ—ভাষা—ধ্যানধারণা—উর্বর ভূমির পূজা] ... ৯—১৩

অনুশীলনী ... ১৪

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

[শহরের আবির্ভাব—ব্যবসা-বাণিজ্য—সমাজ জীবনের পরিবর্তন—শ্রেণী—গোষ্ঠী যুদ্ধ—রাষ্ট্রের আবির্ভাব] ... ১৫—১৯

নদী উপত্যকা অঞ্চলে নদীমাতৃক সভ্যতা বিকাশের কারণ ... ১৮—১৯

অনুশীলনী ... ২০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ — ২১

মেসোপটেমিয়া
[অবস্থান ও প্রাচীনত্ব—উর্বর মৃত্তিকা ও শস্য সম্পদ—বন্যা প্রতিরোধ—অন্যান্য বৃত্তি—সুমেরীয়গণের কৃতিত্ব—ধাতু শিল্প—যাতায়াত—ব্যবসা-বাণিজ্য—লিপি] ... ২১—২৮

মিশর
[অবস্থান — ভূ-প্রকৃতি—ফেরাও—পুরোহিত—লিপি ও লেখক—খাজনা আদায়কারী — সৈনিক — ব্যবসা-বাণিজ্য — পিরামিড—ধর্মীয় বিশ্বাস — প্রধান বৃত্তিসমূহ] ... ২৮—৩৭

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা
[অবস্থান—আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত—নগর পরিকল্পনা—প্রাচীর—রাজপথ—পানীয় জলের ব্যবস্থা—রাজপ্রাসাদ — খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী—অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস—ব্যবসা-বাণিজ্য—হাতের কাজ—পূজা-ধর্ম—সমাজ-জীবন ও শ্রেণীবিন্যাস] ... ৩৭—৪৬

চীন দেশ
[চীন সভ্যতার উন্মেষ—প্রাচীন-কালের চীন - পৌরাণিক কাহিনী : প্লাবন] ... ৪৬—৪৮

নদীমাতৃক সভ্যতার লক্ষণগত ঐক্য
[সামাজিক জীবনধারা—অর্থ নৈতিক জীবনধারা] ... ৪৮—৫১

অনুশীলনী ... ৫২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

লৌহ যুগের সমাজ

[লোহা আবিষ্কার—এবং তার ব্যবহার ও প্রভাব রাজশক্তির বিকাশ] ৫৪—৫৬

ব্যাবিলন

[কৃষি—ব্যবসা-বাণিজ্য — মন্দির ও পুরোহিত—শিক্ষা-সংস্কৃতি—হামুরাবির আইনের সংকলন] ৫৬—৬০

মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার

[উপনিবেশ—পুরোহিতগণের ক্ষমতা] ৬০—৬৩

ইরাণ

[পারস্যের অভ্যুদয়—গ্রীকদের সাথে বিরোধ—জরাথুষ্ট্র] ৬৩—৬৭

ইহুদি জাতি

[মিশরে ইহুদিগণ—হিব্রুদের মুক্তি অভিযান] ৬৭—৬৯

অনুশীলনী ৬৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

গ্রীস

[গ্রীসে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব — হোমারের যুগ—নগর-রাষ্ট্র—যোগা-যোগ —উপনিবেশ] ৭১—৭৪

[এথেন্স—স্পার্টা—এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন—এথেন্স বনাম স্পার্টা] ৭৪—৭৮

[এথেন্সের মহান সংস্কৃতি—সাহিত্য—শিল্পকলা—ধর্ম—পেরিক্লিস—সোফো-ক্লিস—সক্রেটিস—হেরোডেটাস] ৭৮—৮১

[ম্যাসিডন—আলেকজাণ্ডার — বিজয় অভিযান—ভারত অভিযান—সাম্রাজ্যের পতন] ৮২—৮৫
অনুশীলনী ৮৫

সপ্তম অধ্যায় ঃ

রোম

[রোমের উদ্ভব — কার্থেজের সাথে যুদ্ধ—রোমের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা —পার্টিসিয়ান—প্লেবিয়ান — নাগরিক অধিকার—দাস প্রথা ও দাস বিদ্রোহ] ৮৭—৯৩
[জুলীয়াস সীজার—রোমান সাম্রাজ্য—নতুন সাম্রাজ্য ঃ অধঃপতন ও ধ্বংস —খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান] ৯৩—৯৮
অনুশীলনী ৯৯

অষ্টম অধ্যায় ঃ

চীনদেশ

[মহান শাং—সমাজ ব্যবস্থা—জীবিকা —কনফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশ—চীনের প্রাচীর—চীন সাম্রাজ্য] ১০০—১০৩
অনুশীলনী ১০৩

নবম অধ্যায় ঃ

ভারত

[আর্যদের আগমন — বেদ—বৈদিক যুগের সমাজ—ধর্ম ও রাজনীতি—মহাকাব্য—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম—মৌর্য, কুশান ও গুপ্ত সাম্রাজ্য — প্রাচীন বাংলা—বৈদেশিক যোগাযোগ—বিদেশী পর্যটক—মেগাস্থিনিস ও ফাহিয়েন—প্রাচীন ভারতে শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয়] ... ১০৫—১২৭
অনুশীলনী ১২৭

SYLLABUS : HISTORY —CLASS-VI

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS :

A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development).

(ii) How we come to know of ancient people.

B. **Early man :** Use of fire as early as 300,000 B.C. (by 'Peking Man') : Food gathering man.

Old Stone Age : Nature of tools and implements, their uses.

New Stone Age : (By 8000 B.C.) :

Evolution of tools and implements. Man—a food producer. **The Neo-lithic revolution** consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) ; weaving (clothings) ; dwelling —stone houses with defences ; early transport beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.

C. **Copper-Bronze Age :** Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; soew changes in
'91')SHRLUSHRDLUCMFWYP some changes in
social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.

D. **The Early Civilisations** (3000 B.C.—1500 B.C.)—

Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China—in outlines :

(i) **Mesopotamia :** (a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas. (b) Fertility of the soil,—crops. (c) Defence against floods. (d) Other occupations. (e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco, stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.

(ii) **Egypt :** (a) Location and nature of the land ; (b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) ; (c) Trade ; (d The Pyramids (examples ; (e) Religious beliefs ; (f) Chief occupations.

(iii) **The Indus Valley :** (a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ; (b) Town planning ; (c) Food and other articles of use ; (d) Crafts ; (e) Trade ; (f) Worship ; (g) Light thrown by relics upon classification in society.

(iv) **China :** (a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ; (b) China in early times ; (c) Myths (particularly of flood).

(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.

E. **The Iron Age-Societies :** (a) Discovery and use of iron, its impact ; (b) Main features of social and economic life ; (c) Growth of Kingship.

I. (i) **Babylon :** Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and culture ; The Code of Hamurabi—nature of society revealed by the Code.

(ii) **Egypt as an Imperial power :** Colonies ; The power of priests.

(iii) **Iran :** Rise of Persia ; Zoroaster.

(iv) **The Jews :** Hebrews in Egypt ; Hebrew exodus under Moses —flight from Slavery.

II. **Greece** (only in broad outlines) : An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and sparta their social and political life. Athens Vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles, Sophocles, Socrates, Herodotus, Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.

III. **Rome :** Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Particians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus).

Julius Caesar : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.

IV. **China :** "Great Shang". Confucius—his teahcings. Building the Great Wall. The Chin Empire.

V. **India :** (a) The coming of the Aryans. (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buudhism. (f) The Empires—a brief outline of developments from the Mauryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials. viz., inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particularly with Central Asia)—their impact upon society and trade ; (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien —general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only). (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).

প্রথম অধ্যায়	ক. ইতিহাস ও মানব সভ্যতা খ. প্রাচীন মানুষের কথা জানার উপায়

ইতিহাস ও মানব সভ্যতা

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানটি তোমরা সবাই শুনেছ। আমাদের এই বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবী শুধু ধন ধান্যে, ফলে ফুলেই সাজানো নয়. এখানে আরও অনেক কিছু আছে। নানা দেশে নানা ধরনের লোক, নানা ভাষা, নানা মত আর বিভিন্ন এদের রীতি-নীতি। এই সব মানুষের কথা না জানলে পৃথিবীকে জানা যাবে না। আমাদের এই পৃথিবী একদিনে সৃষ্টি হয়নি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর মাটি, উদ্ভিদ আর প্রাণিজগৎ। এই প্রাণিজগতের অন্যতম অংশ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী। এই মানুষের কথা বিচিত্রতায় ভরা। সৃষ্টির সেই আদিযুগ হতে শুরু করে আদিম মানুষ কেমন ভাবে নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্য হয়ে উঠলো, কেমন ভাবে নিজের অনিশ্চিত জীবনধারাকে সুনিশ্চিত করলো আর কেমন ভাবেই বা মানুষ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করলো নূতন সভ্যতা, তার সম্যক পরিচয় না জানলে মানুষের কথা ঠিকভাবে জানা যায় না। গুহাবাসী মানুষ, শিকারজীবী মানুষ ধীরে ধীরে ঘর বাঁধতে শিখলো, নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করতে সচেষ্ট হলো। মানুষ প্রথমে শিকার করা পশুর কাঁচা মাংস খেত। ক্রমশঃ সে শিখলো আগুনের ব্যবহার। ঘরবাড়ী বানিয়ে চাষ আবাদ ও পশুপালন শিখতে আরও অনেকদিন কেটে গেল। পৃথিবীর উর্বর জায়গাগুলি বেছে নিয়ে ছোট ছোট গ্রামে এরা বাস করতে লাগলো। ধাতুর যন্ত্র তৈরি করতে শিখে বড় বড় মন্দির, সমাধি মন্দির তৈরি করল। নিত্যনূতন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে তুললো ও সভ্য হল। ইতিহাস মানুষের ফেলে আসা দিনগুলোর সন্ধান দেয় ও মানব সভ্যতার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ দেয়। কাজেই মানুষের জীবনের অতীতকে জানতে হলে ইতিহাস পড়া বিশেষভাবে দরকার।

প্রাচীন মানুষের কথা জানার উপায়

প্রাচীন মানুষ সেদিনের পৃথিবীতে সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকাই ছিল তার পক্ষে কঠিন। লেখাপড়া শিখেছে মানুষ অনেক পরে। তাই প্রাচীন মানুষের লেখা কোন ইতিহাস নাই। তা বলে তাদের কাহিনী বলা যাবে না তা নয়। নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রার কথা খুঁজে বের করা হয়েছে। তার থেকেই আমরা বহু যুগ আগের কথা বিশেষভাবে জানতে পারি। প্রাক-ঐতিহাসিক কালের কাহিনী জানার কতকগুলি উপায়ের কথা বলছি।

(১) **নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন ঃ** প্রাচীন মানুষ ফেলে গেছে শুধু তার দেহাবশেষ, ব্যবহার্য হাতিয়ার ও অন্যান্য জিনিস আর গুহার গায়ে
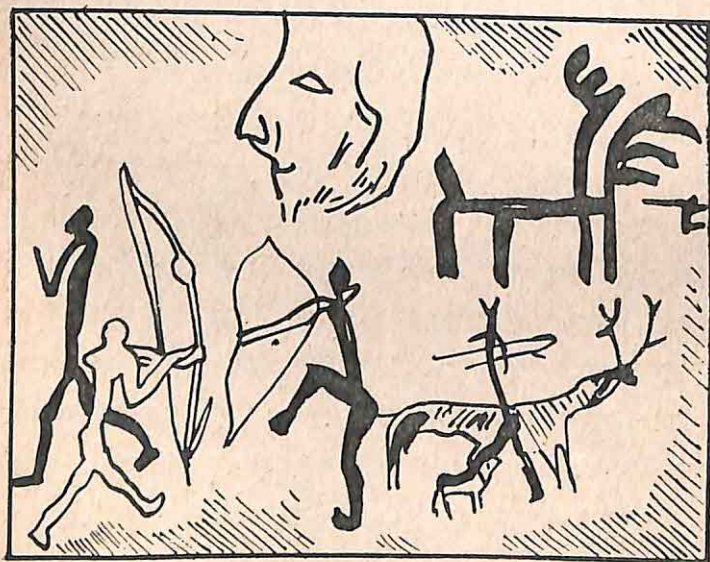
প্রাচীন যুগের গুহাচিত্র

আঁকা ছবি। তারা যে পশুগুলির মাংস খেত তাদের হাড়, পোড়া আগুনের চিহ্ন প্রভৃতিও গুহার মধ্যে পাওয়া গেছে। পৃথিবীর নানা স্থানে মাটির তলা থেকে প্রস্তরীভূত মানুষের কঙ্কাল অথবা অস্থি

পাওয়া গেছে। দেশে দেশে বহু আদিম মানুষের এমনি সব কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তার থেকে তাদের দেহের আকৃতি ও প্রকৃতি, হাতিয়ার, খাদ্যপ্রণালীর কথা জানা সম্ভব হয়েছে।

(২) **প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন:** মাটি খুঁড়ে মানুষের প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। নানা ধরনের পাথরের হাতিয়ার, পোড়া মাটির উপর রং করা ও নক্সা আঁকা বাসনপত্র, খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হাতিয়ার ও নানা ধরনের মূর্তি, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি থেকে প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রার নানা কথা জানা গেছে। বহু জায়গার মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান মিলেছে।

(৩) **প্রাচীন চিত্র ও লিপি:** মানুষের আঁকা সব চাইতে প্রাচীন ছবি পাওয়া গেছে ফ্রান্সের গুহায়। ক্রোমানিঞঁার মানুষের আঁকা একটি পশুর ছবি গুহার গায়ে আঁকা আছে। এই ছবি প্রায় ২০,০০০ বছর আগেকার। মেসোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকায়ও অনেক ছবি পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে সে সময়কার লোকের জীবনযাত্রা প্রণালীর খবর পাওয়া যায়। সিন্ধু উপত্যকায় সীলমোহরের উপর খোদাই করা নানা রকম জীবজন্তুর ছবি পাওয়া গেছে।

(৪) **স্তম্ভ, শিলালিপি ও মুদ্রা:** প্রাচীন যুগের তৈরী অনেক স্তম্ভ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের উপদেশ, রাজ্যের প্রধান ঘটনাবলী লিখে এই শিলালিপি-গুলি ভারতের নানা জায়গায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। এ লেখা থেকে সে সময়কার অনেক কথা জানা যায়।

(৫) **ধর্মগ্রন্থ, সাহিত্য, পুরাণ প্রভৃতি:** প্রাচীন কালের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সেই সময়কার লোকদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। **বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত** থেকেও সে সময়কার অনেক কথা জানা যায়। গ্রীক পুরাণ ও সাহিত্য থেকে পারসিক ধর্মগ্রন্থ থেকে, খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ "বাইবেল" থেকেও প্রাচীন কালের অনেক কথা জানা যায়।

(৬) **পর্যটক বা ভ্রমণকারীদের বিবরণ:** প্রাচীন কালেও অনেক ভ্রমণকারী দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। এঁদের লেখা থেকেও

সে সময়কার ইতিহাস জানা যায়। এগুলির মধ্যে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস, চীনা পর্যটক ফাহিয়েনের বিবরণ খুব উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস পাঠ করলে আমরা কি জানতে পারি?

২। মানুষের সভ্যতার কথা ঠিকভাবে জানতে হলে আমাদের কি করতে হবে?

৩। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কোন্ প্রাণী? তার কথা কিভাবে জানা যায়?

৪। সৃষ্টির আদিকাল হতে মানুষের জীবনধারা কিভাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ফুটে উঠে?

৫। প্রাচীন মানুষের কথা জানবার উপায় কি কি?

৬। প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ধারা খুঁজে বার করতে আমাদের কি করতে হয়েছে? বুঝিয়ে বল।

৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

(ক) প্রাচীন মানুষ কিভাবে জীবন কাটাত?

(খ) ইতিহাস আমাদের কিসের সন্ধান দেয়?

(গ) ইতিহাসের আগের যুগের ঘটনা আমরা কিভাবে জানতে পারি?

(ঘ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলতে কি বুঝ?

(ঙ) জীবজন্তুর ছবিযুক্ত সীলমোহর কখন পাওয়া গিয়েছে?

৮। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন বসাও :—

(ক) মানুষ প্রথমে ছিল—শিকারজীবী/কৃষিজীবী।

(খ) মানুষের আঁকা সবচেয়ে প্রাচীন ছবি পাওয়া গেছে—ফ্রান্সের গুহায়/আফ্রিকার জংগলে।

(গ) মেগাস্থিনিস হলেন—একজন ব্যবসায়ী/একজন পর্যটক।

(ঘ) প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান মিলেছে—মাটি খুঁড়ে/জলের তলায়।

(ঙ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারী হল—বাঘ/মানুষ।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ——বছর ধরে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর মাটি, উদ্ভিদ আর প্রাণিজগৎ।

(খ) মানুষ প্রথমে শিকার করা পশুর—মাংস খেত।

(গ) ইতিহাস মানুষের—আসা দিনগুলোর সন্ধান দেয়।

(ঘ) বহু জায়গার—খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান মিলেছে।

(ঙ) চীনা পর্যটক—বিবরণ খুব উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক. আদিম মানুষ
খ. পুরা প্রস্তর যুগ
গ. নব প্রস্তর যুগ
ঘ. নব প্রস্তর যুগের বিপ্লব

আদিম মানুষ

আমাদের এই পৃথিবী যেমন বিচিত্র, এখানের মানুষও তেমনি বৈচিত্র্যে ভরা। পৃথিবীতে যে কত রকমের মানুষ আছে তার ইয়ত্তা নাই। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা অবয়বযুক্ত মানুষ পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। এই মানুষের উৎপত্তি হল কেমন করে? কোথায় এরা প্রথমে বাস করেছিল, কি খেত, কেমন পোশাক পরত?—এসব নিয়ে পণ্ডিতগণ নানা অনুসন্ধান করেছেন। এ বিষয়ে যাঁর গবেষণা সবচেয়ে দামী তিনি হলেন চার্লস ডারউইন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, মানুষ হঠাৎ পৃথিবীতে আসেনি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ক্রমবিবর্তিত হতে হতে মানুষে পরিণত হয়েছে। মানুষের ঠিক আগের স্তরে আমরা দেখতে পাই যে প্রাণী, তাকে বলা হয় এপ অথবা বনমানুষ। এর'ই মানুষের নিকটতম আত্মীয়। মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ জয় করেছে প্রাণিজগতকে। বুদ্ধি দিয়ে সে আবিষ্কার করেছে নানা রকমের হাতিয়ার আর সেই সব হাতিয়ার ব্যবহারের কলাকৌশল। যত দিন গেছে আদিম মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি বদল হয়েছে। একদিকে যেমন তার চেহারার উন্নতি হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে তার আবিষ্কারের পরিধি। প্রথম দিকে যে সব আদিম মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করত এবং যাদের প্রস্তরীভূত অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তারা হল জাভা মানব, পিকিং মানব, নিয়ানডারথাল মানব, রোডেশীয় মানব প্রভৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করে এরা নিজেদের অস্তিত্বই কেবলমাত্র বজায় রাখেনি, নিত্যনূতন আবিষ্কারের মাধ্যমে এরা পরবর্তীকালের মানব জীবনকে সহজ করে তুলতে সচেষ্ট ছিল। আগুনের ব্যবহার মানব

সভ্যতার এক বিশেষ দিক। আদিম মানুষই আগুনের প্রকৃত ব্যবহার শিখেছিল অর্থাৎ আগুনকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রাকে সাবলীল করে তুলেছিল। সম্ভবতঃ পিকিং মানবই সর্বপ্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। সে আজ বহুকাল আগের কথা। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩০০,০০০ বছর আগে পিকিং মানব আগুনকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর সেই আদিকালের আদিম মানুষদের দল বন-জঙ্গল থেকে শিকার আর ফলমূল আহরণ করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। আজকের মানুষের মত চাষবাস করে শস্য উৎপাদন অথবা পশুপালন করতে শেখেনি। পাথর আর জীবজন্তুর হাড় দিয়ে তৈরি সব হাতিয়ার দিয়ে এরা খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। তাই এই সব মানুষদের **খাদ্যসংগ্রহকারী মানুষ** বলা হয়।

প্রস্তর যুগ

বহুকাল ধরে আদিম মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে এসেছে। বহুবিস্তৃত এই যুগের নাম প্রস্তর যুগ। দিনের পর দিন গেছে, হাতিয়ার তৈরি এবং ব্যবহারের কলাকৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রস্তর হাতিয়ারের ধরন অনুযায়ী প্রস্তর যুগকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—**পুরা প্রস্তর যুগ** এবং **নব প্রস্তর যুগ**।

পুরা প্রস্তর যুগ

এই সময়কার লোকেরা প্রথমে হাতের কাছে যা পেত তাই ব্যবহার করত অস্ত্ররূপে। এদের মধ্যে ছিল পাথরের টুকরো, পশুর হাড়, কাঠের লাঠি ইত্যাদি। ক্রমে এরা পাথরকে ধারালো করতে শিখলো। বড় পাথরের উপর কোন পাথর রেখে একটা শক্ত পাথর দিয়ে তার উপর মারত। এতে পাথর ছুঁচলো ও ধারালো হত। আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের মাটির নীচে নানা ধরনের অস্ত্র পাওয়া গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নাম করার মত হচ্ছে পাথরের হাত-

কুড়াল—পাথরকে ঘসে-মেজে ঠিক আমাদের ব্যবহৃত কুড়ুলের মত করা হয়েছে। এতে শুধু হাতল নেই। এ দিয়ে মাটি খোঁড়া, কাঠ কাটা, মাংসকে খণ্ড খণ্ড করে কাটা সবই চলত। জাভা মানব, পিকিং মানব প্রভৃতি এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করত। নিয়ান-ডারথাল মানব শিকারে পটু ছিল। বড় বড় হাতির মত বিরাট জানোয়ার যাকে ম্যামথ বলা হয়, ও বড় বড় হরিণ প্রভৃতি বনের পশু শিকার করা ছিল এদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাইসন, বুনো ঘোড়াও এরা শিকার করতো। হাত-কুড়ুল হত ছোট বড় নানা আকারের, আর একে ঘসে-মেজে কাজের উপযোগী করে তোলা যেত।
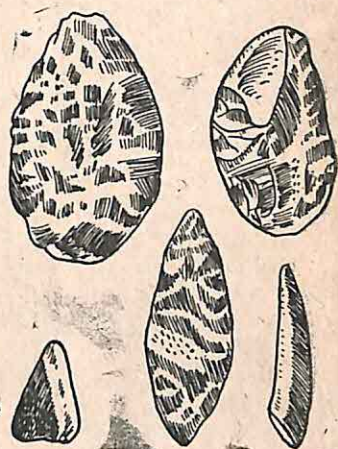
পুরা প্রস্তর যুগের অস্ত্র

পুরা প্রস্তর যুগের শেষের দিকে অস্ত্রশস্ত্রের আরও উন্নতি হল। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য অস্ত্র তৈরি হতে লাগল। পাথরের বাটালি, ছুরি ইত্যাদি তৈরি হতে আরম্ভ হল।

নব প্রস্তর যুগ

এই যুগে পাথরের তৈরি হাতিয়ারের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। হাতিয়ারগুলি আকারে যেমন ছোট ছিল, তেমনি ছিল এদের সুন্দর নির্মাণ কৌশল। পুরা প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের তুলনায় এগুলি খুব মসৃণ ও ধারাল। হাতিয়ারগুলির মধ্যে কুড়াল, ছেনি, বাটালি, কাস্তে, হাতুড়ি প্রভৃতি প্রধান।

এই সময়ে হাত-কুড়ুলকে ঘসে আর তাতে হাতল লাগিয়ে কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কুড়ুলের মাথার দিকে শক্ত আঠা বা লতাপাতা দিয়ে কাঠের হাতল জুড়ে বা বেঁধে দেওয়া হত। এর দ্বারা গাছ কাটা, কাঠের ফালি তৈরি করা হতো। এই ফালি বা তক্তা দিয়ে

একরকম নৌকাও এরা তৈরি করেছিল। নৌকাতে করে নদীতে মাছ ধরত। তাঁবু, ছোট ছোট বাড়ী তৈরীতে এই কুড়ুল কাজে লাগতো।
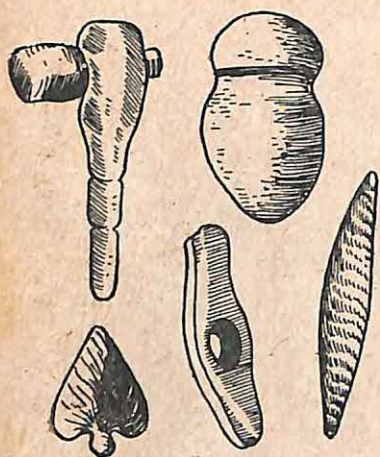
নব প্রস্তর যুগের অস্ত্র

এই ধরনের আর এক রকম অস্ত্র তৈরি হয়েছিল লম্বা ও সরু পাথরের টুকরো দিয়ে, এটা কতকটা গাঁইতির মত। এতে হাতল বেঁধে মাটি খোঁড়া হতো। লাঙ্গল মাটির উপরে মানুষেই টানতো। এই যুগের শেষের দিকে পশু দিয়ে লাঙ্গল টানানো হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৮০০০ বছর আগে এই সব অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি হয়েছিল।

এই সব হাতিয়ার দিয়ে নব প্রস্তর যুগের মানুষ কেবলমাত্র খাদ্য আহরণই করত না, এরা খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগ দিয়েছিল। অর্থাৎ মাটিতে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা চাষবাস করতে শিখেছিল। নানা রকমের ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাটি কুপিয়ে আলগা করত, তারপর প্রয়োজন মত শস্যের বীজ ছড়াত। শস্য পেকে গেলে কাস্তে দিয়ে তা কাটা হত। এমনিভাবে এই যুগের মানুষ খাদ্য উৎপাদনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। তাই এই নব প্রস্তর যুগের মানুষদের খাদ্য-উৎপাদনকারী বলা হয়।

নীল নদের তীরে মিশর, আর টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়াকে বর্তমানে ইরাক বলা হয়। মিশর ও ইরাকের প্রাচীন অধিবাসীরাই সম্ভবতঃ জমি চাষ করে ফসল ফলাতে ও পশুপালন করতে শিখেছিল সবচেয়ে আগে। দুটি অঞ্চলই খুব উর্বর, কৃষিকার্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। প্রাচীনকালে ঐ অঞ্চলে প্রচুর বুনো ঘাস হতো, এই ঘাসের ফলই উন্নত হয়ে গম ও যব হয়েছে। মাঠে এই দানা ছড়িয়ে দিলেই প্রচুর ফসল হতো, বিশেষ পরিশ্রমের দরকার হতো না। ভারতে প্রায় এই সময়েই

চাষের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। এই তিন দেশেই প্রচুর যব, গম ও অন্যান্য ফসল হত। বাড়ীর সকলেই একাজ করতে পারতো। শিকার করা ছিল শক্তি ও পরিশ্রমের কাজ। ছোট ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ ও বাড়ীর মেয়েরা শিকারে যেতে পারত না। শিকারে গিয়ে অনেক সময় বন্য পশুর হাতে অনেককেই প্রাণ হারাতে হতো। অল্প দিনেই কৃষির উন্নতি হল। নব প্রস্তর যুগের শেষ দিক থেকেই এই সব অঞ্চলে যব, গম, বার্লি, ধান, মটর, মসুর প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হতো।

নব প্রস্তর যুগের বিপ্লব

পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষকে খাবার সংগ্রহ করতে হতো। তারা খাবার তৈরি করতে অর্থাৎ কৃষিকাজ করে ধান, গম, যব ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে পারতো না। বনের পশুকে পোষ মানিয়ে বাড়ীতে পালন করতেও তারা শেখেনি। নব প্রস্তর যুগে মানুষ এই দুটো কাজ তো শিখেছিলই, তাছাড়া এমন আরও অনেক নতুন কাজ শিখেছিল যা দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রাই সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। কুমোরের চাকা তৈরি হবার সাথে সাথে মৃৎশিল্পে এল নূতন যুগ। কাপড় বোনার জন্য তাঁত তৈরি হল। ঘরবাড়ী তৈরিরও নতুন পদ্ধতি চালু হল। যাতায়াত ও ভার বহনের জন্য তৈরি হলো গরুর ও ঘোড়ার গাড়ী, গাধাকেও ভার বহনের কাজে লাগানো হতো। এই যুগেই লেখার জন্য লিপি বা বর্ণমালার আবিষ্কার হল। এই বর্ণমালা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতেও শিখলো। মানুষ নানা রকম শিল্প কাজ করতে শিখলো। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে আদান-প্রদান করতে শিখলো ও নূতন মানুষ সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিতে আরম্ভ করল। নৃত্য, গীত ও উৎসবের প্রচলন হল, এর সাথে সাথে নানা দেব-দেবীর পূজাও আরম্ভ হলো। এক কথায় পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ যেভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো নব প্রস্তর যুগের লোকেরা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে জীবন কাটাতে শুরু করল।

এই সব পরিবর্তন এত ব্যাপকভাবে এত তাড়াতাড়ি এসে গেল যে নব প্রস্তর যুগে মানুষদের জীবনে হঠাৎ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা

হলো। কাজেই এই সময়কে বিপ্লব বা যুগান্তর বলা যেতে পারে। বিপ্লবের ভিতর দিয়েই নূতন জীবনযাত্রা চালু হয়েছিল। বিপ্লব কাকে বলে? অনেক দিনের অভ্যাস, অনেক দিনের জীবনযাত্রা প্রণালী যখন বদলে যায় তখনই মানুষের জীবনে আসে বিপ্লব। নব প্রস্তর যুগে মানুষের জীবন-ধারায় এসেছিল এমনই এক হঠাৎ ও আমূল পরিবর্তন।

এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল নীল নদের দেশ মিশরে, মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ বর্তমান ইরাকে আর ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে। প্রাচীন কালে এই অঞ্চলগুলি ছিল কৃষিকাজের খুবই উপযোগী। এই সব অঞ্চলে কৃষি ও পশুপালনের অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে মাটির তলায়।

পশুপালন: কৃষির মতোই পৃথিবীর কোথায় পশুপালন শুরু হয়েছিল বা কেমন করে মানুষ এই কাজ শিখেছিল তা বলা যেতে পারে না। মানুষ নানা কৌশলে বনের পশুকে বশে এনেছে। তারপর তাদের লাগিয়েছে নিজের কাজে। সম্ভবতঃ কুকুরই হল মানুষের প্রথম গৃহপালিত প্রাণী।

প্রাচীন মানুষের গুহায় যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার সাথে পাওয়া গেছে কুকুরের কঙ্কাল। পশুপালন করে মানুষ হল অনেক নিরাপদ। তার জীবন হল অনেক সুখকর। তাকে আর শিকার করতে যেতে হয় না। বাড়ীর ছেলেমেয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও এ কাজ করতে পারে। এদের বংশবৃদ্ধিও হয় খুব তাড়াতাড়ি। যখনই প্রয়োজন তখনই মানুষ মাংস খেতে পারে। পশুর দুধ, ডিম সে রোজই পায়। পশুর চামড়া, হাড় ও শিংও নানা কাজে ব্যবহার হতে আরম্ভ হলো।

মাটির তৈজসপত্র: নব প্রস্তর যুগে মাটি দিয়ে নানা রকমের বাসন-কোসন তৈরি হতো। তারপর এগুলিকে পোড়ান হতো।

পোড়া মাটির পাত্র তৈরি করা সহজ কাজ নয়। সব মাটি দিয়ে গড়ন হয় না, এর জন্য এঁটেল মাটি দরকার। মাটিকে ভাল করে পরিষ্কার করে ছোট ছোট পাথরের টুকরো, কাঠ বা আগাছা আলাদা করে ফেলে দিতে হবে। জল এমন ভাবে মেশাতে হবে যাতে গড়ন দেওয়া যায়, খুব শক্ত বা নরম মাটিতে একাজ হবে না। তারপর নানা আকারের বাসন তৈরি করাও সহজ ছিল না। কারণ হাতেই

প্রথমে এটা হতো—আর সম্ভবতঃ বাড়ীর মেয়েরাই এগুলি তৈরি করতো। মাটির পাত্রে নানারকম নক্সা তৈরি করতেও এযুগের মানুষ শিখেছিল। মাটির তলা খুঁড়ে এমনই রং করা, নক্সা করা পাত্র বের করা হয়েছে। পোড়া মাটি দিয়ে সীলমোহর, দেবদেবীর মূর্তিও তৈরী করা হতো।

এর পর এল বিপ্লব—কুমোরের চাকা তৈরি হবার সাথে সাথেই এর শুরু। কুমোরের চাকাই মানুষের তৈরি প্রথম যন্ত্র। এতে খুব অল্প সময়ে অনেক বেশী পাত্র তৈরি করা যেতো, ইচ্ছে মত আকারও দেওয়া যেত। সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়াতেই এটা প্রথম আরম্ভ হয়েছিল।

বস্ত্রবয়ন ঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ব্যবহার করতো পশুর চামড়া বা গাছের বাকল। এই সময়ই সম্ভবতঃ মানুষ লতা ও গাছের পাতলা ডাল ও ঘাস দিয়ে ঝুড়ি বা চুবড়ি তৈরি করতে শিখেছিল। প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি সময়ে ঘাস, লতা ও পশুর নাড়ী দিয়ে তারা দড়ি তৈরি করত।

নব প্রস্তর যুগে এসে গাছের আঁশ পচিয়ে শক্ত সূতো তৈরি করত। এই সুতো বুনে কাপড়ও তৈরি হত। তাকে কাপড় বলা ভুল হবে। ছাগল, ভেড়া ও অন্যান্য পশুর লোম দিয়েও তারা সুতো তৈরি করতে আরম্ভ করল এই যুগেই। ছাগলের লোম দিয়ে তৈরি কাপড় খুব ভাল হতো। মিশরের পিরামিডে পাওয়া গেছে প্রায় ৬০০০ বছর আগেকার এই ধরনের কাপড়। মমির গায়ে এগুলি পাওয়া গেছে। এই ধরনের কাপড়কে লিনেন বলে। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা পরত পশমের কাপড়। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি হতো পশম।

বুদ্ধিমান মানুষের মাথায় এল টাকু ও তাঁতের কথা। টাকু কাঠের বা পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি হতো। কাঠের তৈরি তাঁত ও টাকুর সন্ধান না পাওয়ারই কথা। পাথরের তাঁত ও টাকু বের হয়েছে মাটির তলায়।

আবাস গৃহ ঃ আদিম মানুষ পশুর মতই গুহায় বাস করত। শীতের হাত থেকে, বৃষ্টির হাত থেকে এইভাবে মানুষ দিনের পর দিন বাস করছে। পৃথিবীর অনেক স্থানে এখনও অনেক গুহাবাসী লোক দেখা যায়। গাছের মোটা ডালকে আড়াআড়ি ভাবে সাজিয়ে তার

উপর ডাল-পালার ছাউনি দিয়েও বাড়ী তৈরি করত। কোন কোন বাড়ীর ছাউনীতে ছিল জীব-জন্তুর চামড়া—এগুলি দেখতে কতকটা তাঁবুর আকারের। গাছের ডালের বেড়া দিয়ে ঘাসের ছাউনী দিয়ে বাড়ী তৈরি করতে অনেক সময় কেটে গেল। এধরনের বাড়ীর দেওয়াল মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হতো।

নব প্রস্তর যুগে মানুষ অনেক উন্নত ধরনের বাড়ী তৈরি করতে শিখল। এই যুগে বড় বড় পাথরকে পর পর সাজিয়ে মানুষ নিজ আবাস তৈরি করত। এই ঘরের দরজা বড় পাথরের চাঁই দিয়ে আটকান থাকত যাতে রাত্রিবেলায় কোন জীবজন্তু হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে। পরবর্তীকালে রোদে পোড়ান ইট দিয়ে বাড়ী তৈরি হল। কাঁচা মাটির সাথে খড় মিশিয়ে ছাঁচে ঢালা হতো প্রথমে, তারপর রোদে শুকিয়ে ইট তৈরি হতো। রোদে পোড়ান ইট দিয়ে সুন্দর বাড়ী তৈরি হতো।

যোগাযোগ ঃ নব প্রস্তর যুগে বিভিন্ন স্থানে গ্রামের ও শহরের পত্তন হয়েছিল। মানুষের নানা প্রয়োজনে গ্রামান্তরে যাওয়ার প্রয়োজনও দেখা দিল। একই গ্রামে সব রকম খাওয়ার জিনিস পাওয়া যেত না—অন্য গ্রাম থেকে আনা হতো। কেমন করে এই ব্যবস্থা চালু হল? মনে করা যাক কোন একটি গ্রামে কৃষিকাজ খুব ভাল হতো। কিন্তু পশু পালনের অভাব ছিল। মাংসের জন্য পশুর বিশেষ প্রয়োজন, তাই ফসল বদল দিয়ে অন্য গ্রাম থেকে পশু আনতে হতো। এইভাবে এক শস্যের বদলে অন্য শস্য অথবা এক পশুর বদল দিয়ে অন্য রকম পশু দেওয়া-নেওয়া হয়।

এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যাওয়া, শস্যক্ষেত্র, গোচারণের ভূমি ও গ্রামান্তরে যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছিল এই সময়েই। গোড়ার দিকে পায়ে হেঁটেই মানুষ যাতায়াত করত। তারপর পশুকে কাজে লাগানো হয়। গরু, গাধা ও ঘোড়ার পিঠে মাল বহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এই যুগে। এ যুগে আবিষ্কৃত কুমোরের চাকাই গাড়ীর চাকাতে পরিণত হয়েছে। যাতায়াতের ও মাল বহনের জন্য নৌকার ব্যবহারও ছিল। কাঠের গুঁড়ি, বা

মোটা তক্তাকে জোড়া লাগিয়ে এই নৌকা তৈরি হতো। লম্বা খাড়া গাছের অনেকগুলি আঁটি একসঙ্গে বেঁধে তৈরি হতো ভেলা।

ভাষা ঃ মানুষের মত মানুষের ভাষাও খুব প্রাচীন। নানা রকম শব্দের সাহায্যে ও ইসারা ইঙ্গিত করেই আদি মানব মনের ভাব প্রকাশ করতো। বাজানোর শব্দও ছিল এই কাজের সহায়, এখনও এর প্রচলন আছে। যেমন—বাঁশী বাজিয়ে রেলগাড়ী চাল'নো, ব্যাণ্ড বাজিয়ে সৈন্যদের মার্চ করানো ও টরে টক্কা দিয়ে টেলিগ্রাফ করা। তারপর মানুষ ছবি এঁকে, দাগ কেটে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। তারপর কথা বলতে ও লিখতে শিখেছে।

ধ্যান-ধারণা ও মনের ভাব প্রকাশ ঃ চিত্রকলার মধ্যে মনের ভাব ফুটিয়ে তোলা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, অন্য কোন জীবজন্তু এটা পারে না। লিখতে শেখার অনেক আগে মানুষ ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করেছে। ক্রোমানিঞঁদের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। এই গুহাবাসী মানুষের আঁকা অনেক ছবি পাওয়া গেছে ফ্রান্স ও স্পেন দেশের গুহার গায়ে। এগুলি ১২,০০০ থেকে ২০,০০০ বছর আগেকার আঁকা।

নব প্রস্তর যুগের ছবিগুলির মধ্যে সুমেরীয় চিত্রকলা খুব প্রাচীন। সৈন্যদের দল বেঁধে যুদ্ধে যাওয়া, বড় লোকদের ভোজ খাওয়া প্রভৃতির ছবি উল্লেখযোগ্য। মিশরের শিল্পীগণের মৃৎপাত্রে ও ধাতুপাত্রে আঁকা ছবি প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বেকার। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে গুহার গায়ে, পোড়া মাটির গায়ে যে ছবি আঁকা হতো তা থেকে প্রাচীন মানুষের ভাবনা-চিন্তার অনেক খবর পাওয়া যায়। এদের কুসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, দলগোষ্ঠীর নামকরণ, দেবদেবী প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদি বোঝা যায়।

উর্বর ভুমির পূজা ঃ মাটি থেকেই ফসল হয়। প্রাচীন মানুষ তাই মাটিকে মাতৃদেবী বলে পূজা করতে শেখে। পোড়া মাটির গায়ে এই ধরনের নারী মূর্তি পাওয়া গেছে। ফসল বোনার সময়, কাটার সময়, নাচ, গান ও উৎসব করে মাতৃদেবীর পূজা করা হতো। এদের ধারণা ছিল যে এই ভাবে পূজা করলে ভাল ফসল হবে।

Item 5

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ বলতে কি বুঝ? আদিম মানুষ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত? এদের খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষ কেন বলা হয়?

২। পিকিং মানব কোথায় বিকাশলাভ করেছিল? এদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কি জান? পিকিং মানুষের বৈশিষ্ট্য কি?

৩। প্রস্তর যুগ কাকে বলে? প্রস্তর যুগের বিভিন্ন বিভাগের নাম বল। প্রত্যেকটির বিবরণ দাও।

৪। পুরা প্রস্তর যুগের অস্ত্র ও জীবনযাত্রার বিবরণ দাও।

৫। নব প্রস্তর যুগ কি? এই যুগে কি কি ধরনের অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল? এই সময় মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?

৬। "নব প্রস্তর যুগের বিপ্লব"—এই কথার অর্থ কি? কিভাবে এই বিপ্লব সূচিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) পৃথিবীর তিনটি আদিম মানুষের নাম বল।

(খ) কোন্ মানুষ প্রথমে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল?

(গ) মানুষের প্রথম হাতিয়ার কিসের তৈরী?

(ঘ) কোন্ যুগের মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছিল?

(ঙ) পৃথিবীর কোন্ অংশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল?

৮। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন বসাও:

(ক) নিয়নডারথাল মানুষ বিকশিত হয়েছিল—প্রস্তরযুগে/তাম্রযুগে।

(খ) গুহাবাসী মানুষের আঁকা বহু ছবি পাওয়া গেছে—আফ্রিকার গুহায়/ফ্রান্সের গুহায়।

(গ) পশুপালন শিখে মানুষ নিজের জীবনকে—অনিশ্চিত করল/নিশ্চিত করল।

(ঘ) হাতকুড়াল সর্বপ্রথম পাওয়া গিয়েছিল—পুরাপ্রস্তর যুগে/নবপ্রস্তর যুগে।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) —দিয়ে মানুষ জয় করেছিল প্রাণিজগতকে।

(খ) —মানবই সর্বপ্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিল।

(গ) আদিম মানুষ—বাস করত।

(ঘ) মানুষ নানা কৌশলে বনের পশুকে—এনেছে।

(ঙ) লিখতে শেখার আগে মানুষ—এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়	ক. নগর পত্তন খ. সামাজিক পরিবর্তন গ. রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

তামার আবিষ্কার মানব সভ্যতায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা করল। এতদিন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানতো না। তাই এসময় অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪৫০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালকে আমরা তাম্র যুগ বলব। তামার সাথে টিন মিশিয়ে যে নূতন ধাতুর সৃষ্টি হল তাকে বলে ব্রোঞ্জ। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ সালে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা টিনের সন্ধান পেয়েছিল। সবচেয়ে আগে তামার সন্ধান পেয়েছিল মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা। প্রথম দিকে তামা মাটির উপরের স্তরেই পাওয়া যেত। খনির সন্ধান পাওয়া যায় অনেক পরে। এক বিরাট সময় জুড়ে তামা আর ব্রোঞ্জ এই দুটি ধাতু মানুষের অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন মিটিয়েছে। এই সময়ের নামই হল **তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ**।

শহরের আবির্ভাব: তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শহরের গোড়া পত্তন। নূতন প্রস্তর যুগ ছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক, কিন্তু এই যুগ হল নগরকেন্দ্রিক। কেমন করে গ্রাম থেকে শহরের সৃষ্টি হল তাই বলা হচ্ছে। গ্রামের লোকেরা বাস করতো ছোট ছোট গ্রামে। তারা জমিতে চাষ করত, পশুপালন করত, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত আর তৈরি করত পোড়া মাটির বাসন। এরা দেব-দেবী, যাদু-মন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বাস করত। সব গ্রামেরই নির্দিষ্ট দেবতা ছিল। দেবতার মন্দির হতো খুব বড়। পুরোহিতের খুব সম্মান ছিল। কারণ ঝড়, অজন্মা, রোগ, শোক হলে মানুষ ধারণা করত দেবতার অভিশাপে তা হচ্ছে। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা নানা জিনিস দিত দেব-সেবায়। এইভাবে দেব-মন্দিরের আওতায় এল অনেক জমি। সেখানে চাষের জন্য কোন ব্যয় হতো না। গ্রামবাসী স্বেচ্ছায় চাষবাস করত মন্দিরের জমিতে। ফসলও ফলত

প্রচুর। এই ফসলের হিসাব রাখার জন্য কিছু লোকও থাকতো। হিসাব রাখার জন্য কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু সব লোকই এক কাজ পারতো না। এই ভাবেই সংখ্যা গণনার উৎপত্তি যেমন হলো তেমনি এক নূতন শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হলো।

গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও সব সময় নিরাপদ ছিল না। কারণ গ্রামের উদ্বৃত্ত ফসল বা গৃহপালিত পশুগুলি জোর করে দখল করার জন্য গ্রামান্তরের লোকেরা বা যাযাবর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই আসতো। এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গ্রামের চারদিকে উঁচু প্রাচীর দেওয়া হতো—প্রহরীর ব্যবস্থাও ছিল। এই প্রহরী থেকে যোদ্ধা বা সেনানী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা যুদ্ধে হেরে গেলে হয় পালিয়ে অন্য গ্রামে চলে যেত আর না হয় বিজয়ী সর্দারের আশ্রিত হয়ে থাকতো—অর্থাৎ তাদের হুকুম মত কাজ করতে বাধ্য হতো। এরা থাকবার জায়গা পেত আর খাবার পেত। তার বিনিময়ে মনিব বা সর্দারের আদেশ মত এদের জমিতে চাষ আবাদ করত, পশুপালন করত আর বাড়ীর অন্যান্য কাজও করত। এই শ্রেণীর লোকদের আমরা বিনা মজুরীর চাকর বা দাস বলতে পারি।

নূতন প্রস্তর যুগের গোড়ার দিকেই রোদে পোড়া ইট দিয়ে বাড়ী তৈরি হতো। তারপর আগুনে পোড়ানো ইট দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরি হতে আরম্ভ হলো। সুন্দর সুন্দর রাস্তাঘাট, বড় বড় দেবতার মন্দিরও তৈরি হতে আরম্ভ হল। প্রচুর ফসল, গৃহপালিত পশু, মাছ ধরার ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকার জন্য মানুষের অবস্থাও ভাল হল; আর জনসংখ্যাও যেমন বাড়তে লাগলো তেমনি বাড়ীঘরও ভাল করার দিকে মানুষ মন দিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ স্থলপথে যাতায়াতের জন্য, আর মাল বহনের জন্য তারা ব্যবহার করতো গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী। জলপথের ব্যবস্থা পাল তোলা নৌকা। টাকা-পয়সার প্রচলন তখনও হয়নি, তাই ফসলের বদলে পশুপাখী, মাটির বাসন প্রভৃতি বদল দিয়ে তারা কাঠ, মূল্যবান পাথর আর তামা টিন প্রভৃতি নিয়ে আসতো। এইভাবে

পৃথিবী, অন্যান্য মানুষের যোগাযোগ হয়েছিল আর শুরু হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের।

সমাজ-জীবনের পরিবর্তন : সে সময়ে মানুষ বাঁচার তাগিদে দল বেঁধে বাস করতে শিখেছিল। বন্য পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে, পশু-পাখী শিকার করতে, বনের ফলমূল সংগ্রহ করতে মানুষকে দল বাঁধতে হয়েছিল। এক একটি পরিবার এক একটি বাড়ীতে বাস করত। কতকগুলি পরিবার একটি গ্রামে বাস করত। এরা যখন পশু শিকার করে আনতো তখন সবাই মিলেই ভাগ করে খেত। প্রত্যেকের নিজের নিজের হাতিয়ার থাকতো। তবে নিজের বলে আর কিছু ছিল না। কোন লোক বা দল কোন লোককে বড় বা ছোট বলে মনে করত না। সবাই সমান ছিল।

এরপর মানুষ জমি চাষ করে ফসল ফলাতে শিখল, মাছ ধরতে শিখল, মাটির বাসন, পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে শিখল। নিজেদের বাসগৃহও তৈরি করতে শিখল। তখন স্বাভাবিকভাবেই কিছু কাজকর্মের ভাগ দেখা দিল। সব লোক সব কাজ করতে পারে না। সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ কৃষিকাজ, কেউ পশুপালন বা অন্য কোন কাজ করতো।

উন্নত ধরনের কৃষিকাজ ও পশুপালনের ফলে অনেক এলাকায় উদ্বৃত্ত ফসল সঞ্চয় করার ব্যবস্থা হলো। হানাদার যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা বা অন্য কোন এলাকার বলবান লোকেরা এসে এই ফসল বা গৃহপালিত পশু লুঠ করতো বা সমগ্র এলাকাটাই দখল করতো। এইভাবে এক দলের লোকের সাথে আর এক দলের, একটা ট্রাইবের বা গোষ্ঠীর সাথে আর একটা ট্রাইবের বা গোষ্ঠীর যুদ্ধ আরম্ভ হতে লাগল। কোন বলবান সর্দার বা নেতা একটা হানাদার দলের নেতা হতো। তার সঙ্গে থাকতো কিছু লোক। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা এক একটা এলাকা দখল করতো। কখনও কখনও একাধিক এলাকা আক্রমণ করে সমস্ত এলাকাটাই দখল করত। যারা যুদ্ধে হেরে যেত তারা অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো। যারা পালাতে পারতো না তারা বলবান দস্যু সর্দারের অধীনে থকে যেত। সর্দার বা নেতা

পরাজিত শত্রুকে বধ করতো না। তাদের ঐ এলাকাতেই থাকতে দিত, খাওয়া-পরার সংস্থান করে দিত, বিনিময়ে তাদের দিয়ে সব রকম কাজ করিয়ে নিত। এইভাবে দাস প্রথার সৃষ্টি হল। সমগ্র এলাকাটাই যখন সর্দার, নেতা বা রাজার হাতে আসতো তখন ঐ এলাকার সব ফসল, সব পশুই তাদের হয়ে যেত। এইভাবে এদের হাতে ক্ষমতা ও মূলধন (তখনকার দিনে শস্য, গৃহপালিত পশুই ধন ছিল) এসে গেল। একদল হল নিঃস্ব ক্রীতদাস, আর একদল বড়-লোক। যেমন প্রধান নেতা, তার অধীনে যে ছোট ছোট নেতা বা সর্দার ছিল তারা, এমনকি যারা যুদ্ধ করে সেই সৈনিক তারাই বড় লোকের দলে পড়ল। আর একদল হল কারিগর, শিল্পী, চাষী ও দাস।

অনেকগুলি এলাকার মালিকগণ নিজেকে রাজা নামে পরিচিত করল। গ্রামগুলি উন্নত হল, রাস্তাঘাট তৈরি হল, তৈরি হল বড় বড় মন্দির। লোকসংখ্যাও বেড়ে গেল। কাজেরও সুস্পষ্ট ভাগা-ভাগি হয়ে গেল।

নদীর উপত্যকা অঞ্চলে নদীমাতৃক সভ্যতা বিকাশের কারণ : নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে। প্রথমটি **মেসোপটেমিয়া** যার বর্তমান নাম ইরাক। গ্রীক ভাষায় মেসোপটেমিয়া কথার অর্থ হলো দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার দ্বিতীয় কেন্দ্র হল নীল নদের দান **মিশর**। স্থানটি খুব বড় নয়, তবে এখানকার সভ্যতা খুব প্রাচীন। নীল নদে প্রতি বছর একই সময়ে বন্যা আসে, আর সমগ্র অঞ্চলটাই প্লাবিত হয়ে যায়। বন্যার জল সরে গেলে দেখা যেত প্রচুর পলিমাটি পড়ে আছে মাটির উপর আবরণের মত। শুধু বীজ ছড়িয়ে দিলেই এখানে প্রচুর ফসল ফলতো, খুব চাষবাসের প্রয়োজন হতো না।

সভ্যতার তৃতীয় কেন্দ্র আমাদের দেশ ভারতের **পঞ্চনদ অঞ্চলে**। এই অঞ্চল এখন পাকিস্থানে। সিন্ধু নদ আর তার পাঁচটি শাখা এস্থানকে পালিত ও উর্বর করেছে। মাটি খুঁড়ে এখানে খুব উন্নত ধরনের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে দুটি স্থানে এই নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হল **মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা**।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে পৃথিবীতে এত স্থান থাকতে কেবল নদীর উপত্যকাতেই কেন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল?

এর প্রথম ও প্রধান কারণ, জল যেমন আমাদের প্রয়োজন, প্রাচীন মানবেরও তা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। কি মানুষ, কি জীবজন্তু সকলেরই জলের প্রয়োজন। মানুষ তাই স্থায়ী আস্তানার সন্ধান করেছিল নদীর কাছাকাছি স্থানে।

দ্বিতীয়তঃ, চাষের জন্য উর্বর স্থানের দরকার আর পশুপালনের জন্য দরকার চারণ ভূমি। উপরে বর্ণিত স্থানগুলি এই দুই সমস্যার সমাধান করেছিল। তা ছাড়া নদীর মাছ শিকার ও খাদ্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয়তঃ, যাতায়াতের জন্য জলপথ বিশেষ সুবিধা দান করেছিল। একস্থান থেকে দূরবর্তী আর একস্থান যেতে হলে তখনকার দিনে নদীপথই মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল। নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে মানুষ এই সুবিধা গ্রহণ করেছিল।

চতুর্থতঃ ঘরবাড়ী নির্মাণ ও মৃৎশিল্পের জন্য উপযুক্ত মাটির অভাব এই অঞ্চলে ছিল না। ইট তৈরীর জন্য সুমেরীয়গণ কাদার ব্লক তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নিত। তারপর রোদে পোড়া ইটের বাড়ী তৈরি করতো।

পঞ্চমতঃ নাগরিক সভ্যতায় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার উল্লেখযোগ্য। ঘরবাড়ী তৈরি, গাড়ী ও তার চাকা প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত কাঠ উপরোক্ত তিনটি অঞ্চলে পাওয়া যেতো না। এগুলি আনতে হতো অনেক দূর থেকে। খুব বড় বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি তৈরি করতে হলে বড় বড় পাথর দরকার। এই অঞ্চলগুলিতে পাথরও পাওয়া যেতো না। মিশরের পিরামিডের জন্য বড় বড় পাথরের চাঁই নীল নদের উপর দিয়ে ভাসিয়ে আনা হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সভ্য মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। পরস্পরের সভ্যতা, সংস্কৃতির আদান-প্রদানও সম্ভব হয়েছিল। নদীর উপত্যকা অঞ্চল এভাবে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতাকে সাহায্য ও পরিপুষ্ট করেছিল।

অনুশীলনী

১। তামার আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছিল ?

২। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে শহরের পত্তন কিভাবে হলো সংক্ষেপে বল। শহরের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

৩। তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কি কি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ? এই সব পরিবর্তনের প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা কর।

৪। নদীমাতৃক সভ্যতা কি ? কিভাবে এবং কেন এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ?

৫। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে নদীমাতৃক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ কাকে বলে ?

(খ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে দাসপ্রথার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল ?

(গ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে কাজের সুস্পষ্ট ভাগাভাগি হয় ?

(ঘ) তাম্র-বোঞ্জ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি কেমন ছিল ?

(ঙ) কোন্ কোন্ অঞ্চলে নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ?

৭। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে দেবতার মন্দিরের আকার ছিল—খুব ছোট/খুব বড়।

(খ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে যে ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী হতো তা ছিল—আগুনে পোড়ানো/রোদে শুকানো।

(গ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে মানুষ জমি চাষ করতে—শিখেছিল/শেখে নাই।

(ঘ) মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম—ইরাক/ইরাণ।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) গ্রীকভাষায় মেসোপটেমিয়ার অর্থ দুইটি নদীর — স্থান।

(খ) তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে কতকগুলি পরিবার একটি — বাস করত।

(গ) তামার সাথে — মিশিয়ে তৈরী হলো ব্রোঞ্জ।

(ঘ) প্রথম দিকে তামা মাটির — স্তরেই পাওয়া যেত।
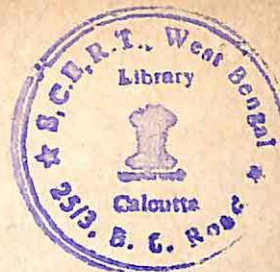
চতুর্থ অধ্যায়	ক. মেসোপটেমিয়া খ. মিশর গ. সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ঘ. চীন সভ্যতা

প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ

খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর কয়েকটি স্থানে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নিত্যনতুন আবিষ্কার এবং নানা প্রয়াস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সভ্যতা-কেন্দ্রগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। মানুষের জীবন নবরূপে রূপায়িত হল। পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা অন্তর্হিত হল। মানুষের জীবন একাধারে যেমন হল নিশ্চিন্ত, অপরদিকে তেমনি তা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি নদীকে কেন্দ্র করে প্রথম সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এগুলি হল মেসোপটেমিয়ার **ট্রাইগ্রীস** ও **ইউফ্রেটিস** নদী, মিশরের **নীলনদ**, ভারতবর্ষের **সিন্ধুনদ**, এবং চীনের **হোয়াংহো** এবং **ইয়াংসিকিয়াং** নদী। এই সব প্রাচীন নদীর তীরবর্তী এলাকায় উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। আমরা এখন সেই সব নদীমাতৃক সভ্যতার নানা কথা আলোচনা করব।

মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও প্রাচীনত্ব: ইরাকের নাম তোমরা শুনে থাকবে। প্রাচীন কালে এই ইরাককেই মেসোপটেমিয়া বলা হত। গ্রীকদের দেওয়া এই নাম—যার অর্থ 'দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ'। নদী দুইটি হল **ট্রাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস**। দুইটি নদীরই উৎপত্তি স্থান তুরস্ক! দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ইরাকের মধ্য দিয়ে এসে কুর্ণা নামক স্থানে মিশে পারস্য উপসাগর অবধি এসেছে। মেসোপটেমিয়ার উত্তর

একদল লোক এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। "কালো মাথাওয়ালা লোক" (black headed man) বা সুমের বলে এরা নিজেদের পরিচয় দিত। এরাই সুমেরীয় বলে পরিচিত।
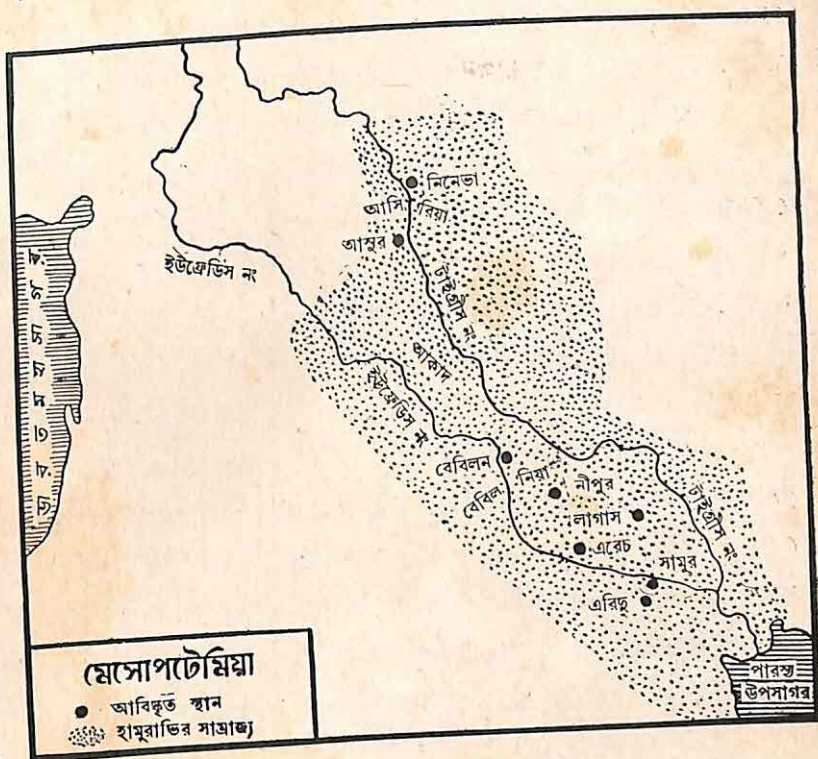
মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার বিস্তার

সুমেরীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের লোকেরা যখন পুরাতন প্রস্তর যুগে বাস করছে, তখনই সুমেরীয়গণ এক উন্নততর নাগরিক সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল। প্রাচীন সুমের শহরের মাটি খুঁড়ে এই তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করা হয়েছে।

উর্বর মৃত্তিকা ও শস্য সম্পদ ঃ মেসোপটেমিয়ার সমগ্র ভূ-ভাগই খুব উর্বর। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝখানে অবস্থিত বলে প্রতি বছরই এখানকার জমিতে বন্যার পর পলিমাটি এসে পড়ে। চাষ আবাদের উপযোগী সরঞ্জামও এদেশের লোকে তৈরি করতে শিখে ফেলেছিল খুব তাড়াতাড়ি। তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু দিয়ে কোদাল,

কুড়ুল, কাস্তে প্রভৃতি তৈরি করেছিল। বলদে টানা লাঙ্গলের ব্যবহারও বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল না! এ অঞ্চলে গবাদি পশুর চারণভূমিরও অভাব ছিল না। উন্নত ধরনের কৃষিকাজের ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য—যেমন, গম, যব, বার্লি, তৈলবীজ প্রভৃতি যে উৎপন্ন হতো তা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থেকে যেত। এই উদ্বৃত্ত শস্য বদল করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতো।

বন্যা প্রতিরোধ ঃ কৃষিকার্যের মতই আবাস গৃহ নির্মাণেও মেসোপটেমিয়াবাসীগণ পটু ছিল। নদীর পলিমাটি দিয়ে ইট তৈরি করে তাকে কড়া রোদে পোড়ান হতো। সেই ইট দিয়ে এরা সুন্দর বাড়ী তৈরি করত। বাড়ীগুলি দেখতে আমাদের বাড়ীর মতই, তবে তাতে জানালা থাকতো না। দরজা তৈরি হতো কাঠের শলা দিয়ে। সেইজন্য আলো-বাতাসের অভাব হত না। কিছু দিনের মধ্যেই এরা রোদে পোড়ান ইট দিয়ে দোতালা বাড়ী, উঠান, তার চারিদিকে সুন্দর রাস্তাও তৈরি করেছিল। উর শহরের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় শহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর রাস্তা, রাস্তার ধারে বাড়ী, দোকান, দোকানে নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এমনকি বিলাস দ্রব্যেরও অভাব ছিল না। শহরের চারিদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। সম্ভবতঃ বাইরের শত্রুকে ঠেকানোর জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীরের ধার দিয়ে গভীর খাল কাটা ছিল। এই খাল নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ছিল। বন্যা প্রতিরোধের জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কারণ নদীতে বন্যা এলে এর জল খাল দিয়ে মাঠে গিয়ে পড়বে।

অন্যান্য বৃত্তি ঃ কৃষি, পশুপালন ছাড়াও মেসোপটেমিয়াবাসীগণ আরও অনেক কাজ করতো। কৃষি ও পশুপালন যারা করতো তাদের আমরা চাষী বলতে পারি। তারপর কারিগর। এদের মধ্যে মৃৎ-শিল্পী, যারা পোড়ামাটির বাসন তৈরি করত। এর মধ্যেই কুমোরের চাকা এখানে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা হাঁড়ী, কলসী, থালা, বাটি, শস্য ও জল রাখার বড় বড় জালা প্রভৃতি মৃৎশিল্পীরা তৈরি করত। পোড়ানোর পর এগুলিতে নানা রং দেওয়া হত ও সুন্দর সুন্দর

নক্সাও আঁকা হতো। কামার বা ছুতোর অর্থাৎ যারা কাঠের কাজ করতো তারা গাড়ীর চাকা, রথ, লাঙ্গল, নৌকা, বাড়ীর ব্যবহারের আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি করত। ঘোড়ায় টানা রথের সুন্দর ছবি দেওয়ালের গায়ে বেরিয়েছে। ধাতু শিল্পীর কাজ ছিল তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি গলিয়ে ছাঁচে ঢালাই করে কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে প্রভৃতি কৃষিকাজের সরঞ্জাম, যুদ্ধের জন্য বর্শা, বল্লম, তরবারী, তীরের ফলা ইত্যাদি তৈরি করা। স্বর্ণকারগণ নানা জাতীয় অলঙ্কার তৈরি করত।

সুমেরীয়গণের কৃতিত্ব ঃ সুমেরীর দেবতা উরনানুরের গম্বুজাকৃতি সুবৃহৎ মন্দির সেকালের স্থাপত্য বিদ্যার নিদর্শন বলা যায়। উর শহরের ঠিক মাঝখানে এটা নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের মাঝখানে উচ্চ বেদী, বেদীতে উঠার জন্য সুন্দর সিঁড়ি ছিল। মন্দিরটি কারুকার্য খচিত। মূর্তিটি দেখলে নির্মাণকারীর শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

শহরের আরও অনেক স্থানে উরনানুরের ও তার স্ত্রীর মন্দির ছিল ; তবে সেগুলি এত বড় আর সুন্দর নয়। উরনানুরের মূর্তিতে নানা অলঙ্কার ও তার ব্যবহারের জন্য নানা আসবাবপত্রও ছিল। মন্দিরটির চারিদিকে উঁচু ইটের তৈরি প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীরের মধ্যেই ছিল রাজার বাড়ী। এই বাড়ীটি সাধারণ বাড়ীর মতই, তবে আকারে অনেক বড়। কারণ রাজার মন্ত্রীগণ, অন্যান্য কর্মচারী ও উচ্চ পদস্থ সৈনিকগণ এখানেই বাস করতেন। রাজ-পরিবারের লোকজনও কম ছিল না. তাদের বাসও এখানেই ছিল। মন্দিরের পুরোহিতের জন্য এখানে বাড়ী ছিল।

প্রাচীনকালের লোকদের মত সুমেরীয়গণও দেবতাকে মানুষের মতই মনে করতো। দেবতাদের জন্য যেমন মন্দির তৈরি করত, তেমনই তার খাবার, থাকবার ও সুখ-সুবিধার জন্য নানা আসবাব-পত্রের ব্যবস্থাও করতো।

উর শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে খননের ফলে যে আবিষ্কার হয়েছে তা থেকে জানা যায় তখনকার দিনে মেসোপটেমিয়ার শহরগুলিতে তিনটি শ্রেণীর মানুষ বাস করত। পুরোহিত, রাজা, রাজকর্মচারী ও

সৈন্যবিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন পুরোহিতগণ। কারণ সব লোককেই পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতে হতো। সমাজে নানা কুসংস্কার ছিল। কোন কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, বন্যা, অজন্মা বা মড়ক হলে লোকে মনে করতো দেবতার কোপেই তা হয়েছে। ব্যক্তিগত অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোন অসুবিধা হলেও লোকে তাই মনে করত। আর দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আসতো নানা উপচার, উপঢৌকন. জমিজমা, শস্য সম্পদ, অলঙ্কার প্রভৃতি। পুরোহিতগণের কাজ ছিল মন্দিরের জমিজমা দেখাশোনা. ফসলের হিসাব রাখা। মন্দিরের ভিতরেই শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। এখানে রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধও বিতরণ করা হত। শহরের মানুষের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা ও বিচারও এরাই করতেন। এর পরই স্থান ছিল রাজার। গোড়ার দিকে প্রধান পুরোহিতই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শহরের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেল, লোকসংখ্যাও বেড়ে গেল। এখন একজনের পক্ষে সব কাজ দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে উঠল। তাই পুরোহিতগণের মধ্যে একজন যোগ্য লোক বাছাই করে তাকে রাজা করা হল। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, খাল ও রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা প্রভৃতি রাজার কাজ ছিল। যুদ্ধের সময় সৈন্য পরিচালনাও রাজার কাজ ছিল। এ ছাড়া কতকগুলি বিচারক ছিল। দেশের লোকের বিচারের ভার এদের উপর ন্যস্ত ছিল। সুমেরীয়গণ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। অশ্বচালিত চাকার রথের ছবি এখানে পাওয়া গিয়েছে। মৃৎশিল্পী, কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পীগণ ছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক।

সুমেরীর সমাজব্যবস্থায় দাসগণের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। পরাজিত শত্রু বা যুদ্ধের বন্দীগণই দাস হতো। এরা বড়লোকদের বাড়ীর যাবতীয় কাজ করত। এছাড়া নগরের রাস্তা, আবর্জনা পরিষ্কার, জল আনা প্রভৃতি এদের কাজ ছিল। কোন কোন দাস নিজেকে মুক্ত করে জমিজমা কিনে চাষবাসের কাজ করতে পারত।

ধাতুশিল্প ঃ পৃথিবীর অন্য স্থানে যখন নূতন প্রস্তর যুগের কাল

চলছে তখনই সুমেরীয়গণ তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখে ফেলেছিল। দক্ষ কারিগর ছাড়া একাজ সম্ভব নয়। তামাকে গলাবার জন্য খুব বেশী তাপ দরকার। এর প্রয়োজনীয় উপকরণ, চুল্লী, হাপর, গলাবার পাত্র, চিমটা প্রভৃতি যন্ত্রপাতিও দরকার। তামা গলিয়ে মোম বা মাটি ছাঁচে ঢালাই করা সহজ কাজ নয়। সুমেরবাসীগণ যে এ কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায় সুমের শহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। এখানে পাওয়া জিনিসগুলির মধ্যে কোদাল; কুড়ুল প্রভৃতি কৃষির যন্ত্রপাতি প্রধান। তা ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র যথা—বর্শা, বল্লম, ছোরা, তরবারি, তীরের ফলা প্রভৃতি দেখে মনে হয় মেসোপটেমিয়ার লোকেরা কারিগরী বিদ্যায় খুবই উন্নত হয়েছিল।

যাতায়াত ঃ মেসোপটেমিয়ায় স্থলপথে যাতায়াতের জন্য সুন্দর রাস্তা ছিল। শহরের রাস্তাগুলি রোদে পোড়ান ইট দিয়ে তৈরি হত। চাকার গাড়ী ও যুদ্ধের সময় রথ ব্যবহার করা হতো। ঘোড়ায় টানা রথের দেওয়াল-চিত্র দেখে অনুমান করা হয় খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের পূর্বেই সুমেরীয়গণ গাড়ী টানার জন্য গরু, ঘোড়া ব্যবহার করত। জলপথে চলার জন্য নৌকার প্রচলন ছিল। লম্বা কাঠের শলা জোড়া দিয়ে এই নৌকা তৈরি হতো। এর উপর পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে, তার উপর পিচ দেওয়া হতো। এই জলযানের সাহায্যে এরা দেশের খালের মধ্যে যাতায়াত করত। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর পারে যেতো। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে সুমেরীয়গণ যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার উর্বর মাটিতে কৃষিজাত ফসল ভাল হতো, কিন্তু এখানে ভাল কাঠ পাওয়া যেত না। খনিজ ধাতুও এ অঞ্চলে দুর্লভ ছিল। তাদের তৈরি করা নৌকোয় কৃষিজাত পণ্য নিয়ে তারা নানা দেশে যেত। শস্য বিনিময় করে ভাল কাঠ, সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি নিয়ে তাদের দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

লিপি ঃ সুমেরীয়গণ এক প্রকার লিপির আবিষ্কার করেছিল। উর শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে অনেক মাটির টালি পাওয়া গেছে। এই টালিগুলির উপর বিন্দু, নানা পশুপাখীর, জীবজন্তুর ছবি আঁকা আছে।

এগুলির পাঠোদ্ধার করে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুমেরীয়গণ খৃষ্টপূর্ব ৩৫০০ সালেই এক প্রকার চিত্রলিপির সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছিল। এই লিপি বা লেখার পদ্ধতিকে "কিউনিফরম" লিপি বলা হয়।
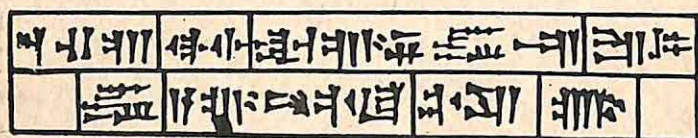
কিউনিফরম লিপি

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ-যুদ্ধ লেগেই থাকতো। সুমেরীয়গণ অনেক দিন ধরে এ অঞ্চলে আধিপত্য করেছিল। সমগ্র ইউরোপ যখন নূতন প্রস্তর যুগ পার হয়নি, সুমেরীয়গণ সেই সময় উন্নততর ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপন করত।

মিশর

অবস্থান ঃ নীল নদের দেশ মিশর, প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। সাগর আর মরুভূমি দিয়ে ঘেরা ছোট একটি শস্যশ্যামল স্থান, আয়তনে দশ হাজার বর্গমাইল। এই স্থানটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে লিবিয়ার মরুভূমি আর দক্ষিণে নিউবিয়ার মরুভূমি। শুধু উত্তরের অংশেই বৃষ্টিপাত হয়, দক্ষিণে খুব কম। নীলনদই এদের প্রাণ। এই নদী না থাকলে এখানে সভ্য মানুষের বাস করা সম্ভব হত না।

ভু-প্রকৃতি ঃ প্রতি বছর সাধারণতঃ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নির্দিষ্ট দিনে নীল নদে বন্যা আসে। আর নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে বন্যার জল সরে যায়। বন্যার পর প্রতি বছর কিছু পলিমাটি এসে মাঠের জমিতে পলিমাটি ফেলে এই স্থানের উর্বরতা বাড়িয়ে তুলতো। চাষীরা এ বিষয়ে অবহিত ছিল বলেই চাষের

কাজ আরম্ভ করা আর শেষ করা তাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়েছিল।
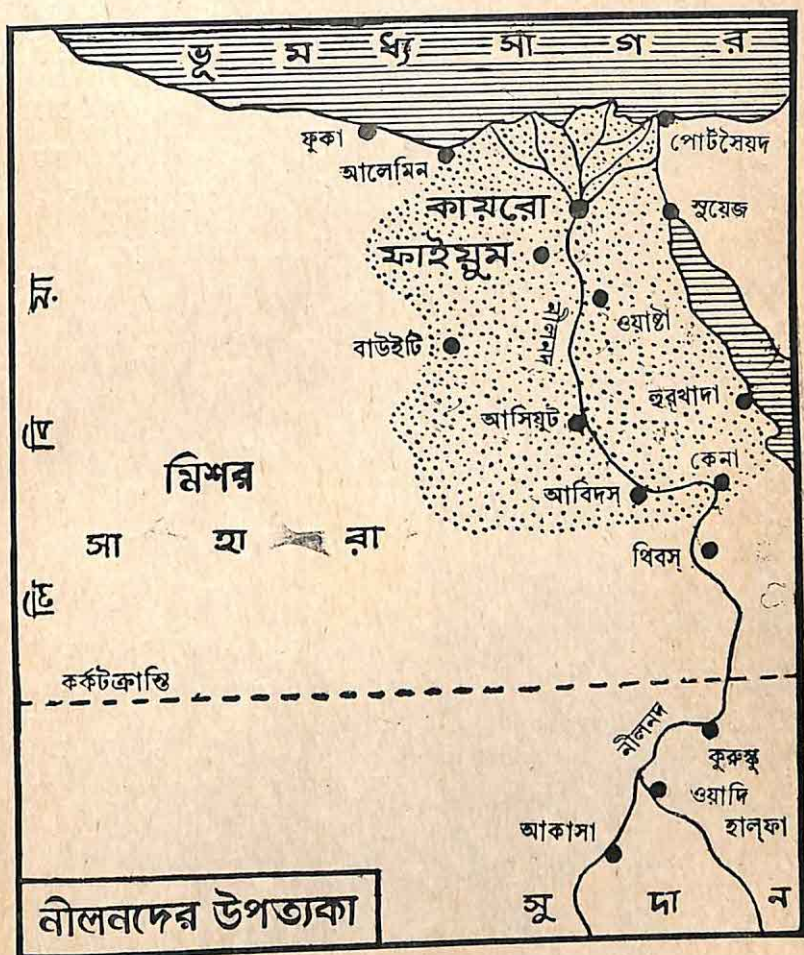
নীলনদ ও প্রাচীন সভ্যতার বিস্তার

মিশরের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে গম, বার্লি, যব প্রভৃতি প্রধান। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু জাতীয় পশু, শূকর, ভেড়া ও ছাগ; এদের মাংস খাওয়া হতো। কখনও কখনও শিকারও করতো। এ অঞ্চলে প্রচুর খেজুরের গাছ ছিল, মধুও পাওয়া যেত। এগুলি এদের প্রধান খাদ্য ছিল।

মিশরের উত্তর ও দক্ষিণ দুটি এলাকাতেই কতকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে গ্রামে বাস করতে আরম্ভ করে। উত্তর দিকে ছিল ২০টি গ্রাম আর দক্ষিণ দিকে ২২টি গ্রাম; মোট ৪২টি গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের চিহ্ন বা টোটেম থাকতো কোন পশু, পাখী, ফুল বা ফল। এই টোটেমকে এরা তাদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করতো। গ্রামের লোকদের মধ্যে জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া মারামারি হতো। গ্রামের প্রধানরা এতে অংশ গ্রহণ করতো। এমনি করেই উত্তর আর দক্ষিণ দিকের লোকদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি চলতে লাগলো। শেষে উত্তর মিশরের একজন শক্তিশালী নেতা যার টোটেম বা প্রতীক ছিল 'বাজপাখী' সে দক্ষিণ মিশরের লোকদের যুদ্ধে হারিয়ে সমগ্র অঞ্চলটা নিজের অধীনে আনলো।

এতে মিশরবাসীদের সুবিধাই হল। সমস্ত স্থানটিই একটি রাজার অধীনে এলো। সমগ্র অঞ্চলের উন্নতির দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তা ছাড়া ছোট-খাটো ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তি করে দিতেন। এই নেতা বা রাজার নাম **মেনেস**, মিশরীয়রা প্রথম ফেরাও বলে।

কয়েকজন অত্যাবশ্যক কর্মী : ফেরাও : প্রাচীনকালে সব দেশেই রাজা থাকতো। তিনি দেশ শাসন করতেন। মিশরের রাজাকে বলা হত **ফেরাও**। ফেরাওকে প্রজারা দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করত। তিনি স্বর্গ থেকেই এসেছেন। মিশরের সবচেয়ে প্রধান দেবতা 'রা' বা 'রি'। ফেরাওগণ তারই বংশধর। তিনি আছেন বলেই স্বর্গের দেবতারা সন্তুষ্ট আছেন। সময় মত বন্যার জল আসছে, বৃষ্টি হচ্ছে, ভাল ফসল হচ্ছে, দেশে রোগ, শোক, মহামারী আসছে না—এই ছিল প্রজাদের ধারণা।

মিশরের প্রথম ফেরাও **মেনেস**। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। দেশের লোকের সুবিধার জন্য তিনি নানা বিধি-ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমতঃ মিশরের উত্তর আর দক্ষিণ দুই ভাগকে এক করে একটি রাজ্যে পরিণত করেন। রাজ্যের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ যাতে না হয় তার জন্য লোক নিযুক্ত করেন। এই ভাবে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। দ্বিতীয়

কাজ কৃষিকার্যের উন্নতি বিধান। মিশরের সকল স্থানেই যাতে নীল-নদের জল যায় তার জন্য খাল কাটার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে মিশরের সর্বত্রই চাষের কাজে খুব উন্নতি হয়। এই খাল কাটার জন্য তিনি এক উৎসবের ব্যবস্থা করেন। নদী থেকে খাল বহুদূর পর্যন্ত কাটা হতো। প্রথমে কিন্তু মুখের কাছে সামান্য জমি ছেড়ে দেওয়া হতো। রাজা নিজের হাতে কোদাল দিয়ে কোপ মেরে কয়েক কোদাল মাটি কেটে নদীর জলের সাথে খালের মুখ মিলিয়ে দিতেন। এই উপলক্ষে যে উৎসব পালন করা হতো তার নাম "খাল কাটা উৎসব"। তাঁর বংশধরেরাও এই উৎসব পালন করতেন।

পুরোহিতঃ রাজার পরেই পুরোহিতগণের স্থান। এঁরা রাজাকে নানা কাজে সাহায্য করতেন। সুমেরীয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিতগণই প্রধান। তাদের মধ্য থেকেই রাজা ঠিক করে দিত। মিশরে রাজাই প্রধান, পুরোহিতগণ রাজার অধীন। রাজাকে তারা ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। প্রজারা যাতে রাজাকে দেবতা বলে মনে করে তার জন্য নানা অলৌকিক কাহিনী, গাথা, গল্প প্রভৃতি রচনা করত। নানা তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যার সাহায্যে রাজার দেবত্ব সম্বন্ধে প্রজার ধারণাকে দৃঢ় করে দিত।

লিপি ও লেখকঃ মিশরে লেখার প্রচলন খুব প্রাচীন। খৃষ্ট-পূর্ব ৪০০০ সালেই ছবির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই লেখার পদ্ধতিকে বলে **হেরিওগ্লাফিক** বা
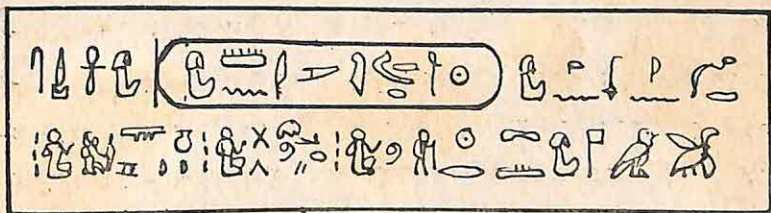
হেরিওগ্লাফিক লিপি

দেবভাষা। ছবিগুলির উচ্চারণই আসল অর্থ নয়। একটা উদাহরণ দিলে ভাল বুঝতে পারবে। মনে কর একটা মৌমাছির পরে একটা পাতার ছবি আঁকা আছে ; এতে কি বোঝাবে। ইংরাজীতে মৌমাছি

হল bee আর পাতা হলো leaf, তুটোর উচ্চারণ মিলে হলো belief, যার অর্থ বিশ্বাস। এইভাবে লেখায় অনেক অসুবিধা দেখা দিল। তারপর লেখা অনেক উন্নত হল আর ছবিগুলি ক্রমশঃ বর্ণমালায় পরিণত হল। এখানে মনে রাখতে হবে যে সবাই এই ধরনের লেখায় অভ্যস্ত ছিল না। এই লেখার জন্য বিশেষ এক ধরনের লেখকের সৃষ্টি হল।

খাজনা আদায়কারী : মিশরের রাজা মেনেস জমির মালিকদের তালিকা তৈরি করেছিলেন। রাজার প্রাপ্য শস্য আদায় করার জন্যও লোক নিযুক্ত ছিল এবং এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ছিল। আদায়কারীগণ রাজার প্রাপ্য আদায় করতো। যারা সময়মত কর দিত না তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। মিশরের দেওয়ালের ছবিতে এই চিত্র দেখা যায়—এক দল লোক খাজনা বা কর দিতে যাচ্ছে। যারা দিল না তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

সৈনিক : রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য লোক নিযুক্ত হয় প্রথম রাজা মেনেসের সময়েই। ইনি যুদ্ধ করে মিশরের দক্ষিণ ভাগের লোকদের পরাজিত করেছিলেন। সেইজন্য অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নিপুণ লোক ও কিছু দলপতি স্থায়ীভাবে তাঁর অধীনে কাজ করতো। এই ভাবে মিশরে সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়। এদের অন্য কোন কাজ ছিল না। মিশরের পরবর্তী রাজারা নানা দেশে সৈন্য পাঠিয়ে দেশ জয়ও করেছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য : মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। নীল-নদের পলিমাটি যেমন দেশকে উর্বর করে তুলেছে, তেমন নদী-পথে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছে। মিশরের রাজারাও ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজার তত্ত্বাবধানে সৈন্যদলসহ বাণিজ্য-জাহাজগুলি সমুদ্রপথে যাতায়াত করত মণিমুক্তা, মূল্যবান পাথর, সোনা, নানা রকম মশলা নিয়ে। তামা আনতে হত সিনাই থেকে। সিনাই-এ তামার খনি ছিল। পিরামিডের জন্য লাগতো বড় বড় পাথর যার এক একটার ওজন হাজার মণেরও বেশী। সেই পাথর আনা হতো তুরা থেকে নীলনদের জলের উপর দিয়ে ভাসিয়ে।

সিরিয়ার সাথেও মিশরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সিরিয়ার লোকেরা সেগুন কাঠ আনতো লেবাননের পাহাড় থেকে। সেই কাঠ নদীপথে মিশরে আসতো বিনিময়ের মাধ্যমে। ভাল জাহাজ, বাড়ীর আসবাবপত্র, শবাধার প্রভৃতি এই কাঠ দিয়ে তৈরি হত।

স্থলপথেও মিশরবাসীগণ এশিয়ার লোকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। সিনাই-এর মরুভূমির উপর দিয়ে এই পথ ছিল। এই পথে লেভান্ট, আনাতোলিয়া, মেসোপটেমিয়া ও ইরাকের সাথে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফেরাও সিনাই-এর খনি অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন। ২৭২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা সেনফ্রু ও এই রকম একটি অভিযান করে ৪০টি জাহাজে এখান থেকে সেগুন কাঠ আনিয়েছিলেন। ক্রীটের সাথেও মিশরবাসীর বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। সম্প্রতি ক্রীটের মাটি খুঁড়ে মিশরে তৈরী অনেক জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্যালেস্টাইনের সাথেও মিশরের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ অনেক দিনের পুরানো। উত্তর মিশরের খনন-কার্যের ফলে প্যালেস্টাইনে তৈরি অনেক মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। প্যালেস্টাইনের জলপাই-এর তেল এগুলিতে ভরে গাধার পিঠে করে আনা হত বলে অনুমান করা হয়, আবার এখানকার মৃৎপাত্রে মিশরে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার প্যালেস্টাইনে যেত। মৃৎপাত্রের আকৃতি-প্রকৃতি দেখে একথা মনে হয় যে, উভয় দেশের প্রভাব মৃৎশিল্প-রীতির উপর পড়েছে। মেসোপটেমিয়ার সাথে মিশরের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। এইজন্য জল ও স্থল উভয় পথই ব্যবহার করা হতো।

পিরামিড ঃ পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিসের মধ্যে পিরামিড অন্যতম। অবশ্য এটা প্রাচীন কালের কথা। কিন্তু ৫০০০ বছর আগেকার এই বিরাট সমাধিমন্দিরগুলি দেখে এখনো লোকের বিস্ময় জাগে। আসলে কিন্তু এগুলি মৃতের কবর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন মিশরবাসীরা পরলোকে বিশ্বাস করত—তার অর্থ তারা মনে করত মানুষ মরে গেলেই তার সব শেষ হয়ে যায় না। ফেরাওদের কথা আরও আলাদা; তারা তো আর সাধারণ মানুষ নন, দেবতার

I+e
5

বংশধর, দেবতার প্রতিনিধি। মরার পর তারা স্বর্গে দেবতাদের কাছেই চলে যান। সেখান থেকে প্রজাদের মঙ্গল বিধান করেন। ফেরাও মরে গেলে তাঁর কবরের ভিতর দেহটি যাতে নষ্ট না হয়, আর সেখানে থাকবার কোন অসুবিধা না হয় এই সব ভেবেই এই পিরামিডগুলি তৈরি করা হয়েছে। মিশরের তৃতীয় রাজবংশের শেষ রাজা জোসারই
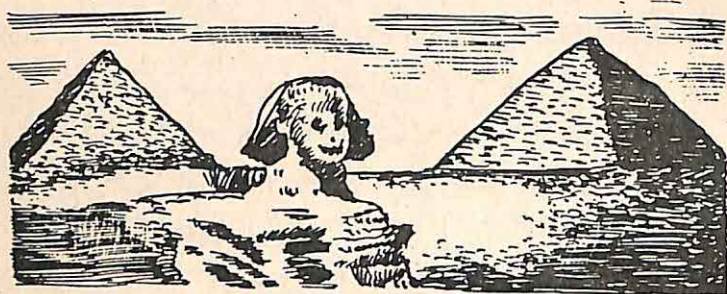
মিশরের পিরামিড

প্রথমে পিরামিড তৈরি করেছিলেন। নীলনদের তীরে সাক্কারায় ৫০০০ বছরের আগে তৈরী হু'শ ফুট উচ্চ এই সৌধটি আজও টিকে আছে। একে **সিঁড়ি পিরামিড** বলে।

কিন্তু যে পিরামিডকে সপ্তাশ্চর্যের একটি বলে মনে করা হত সেটি চতুর্থ রাজবংশের রাজা খুফু তৈরি করেছিলেন ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। তিনি খুব শক্তিশালী ও ধনবান রাজা ছিলেন। তা না হলে এমন সমাধি মন্দির নিজের জন্য তৈরি করতে পারতেন না। এটি তৈরি করতে তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক লক্ষ লোক কুড়ি বছর ধরে এই সৌধ তৈরি করেছিল। তের একর জমির উপর এই পিরামিডের উচ্চতা ৪৮১ ফুট—একটি চল্লিশ তলা বাড়ীর সমান। ভিতরে প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৭৬০ ফুট। বর্তমান কাইরো শহরের কাছে নীলনদের পশ্চিম কূলে গিজা নামক স্থানে এই পিরামিড দেখতে এখনও লোকে যায়। এর ভিতরের সাজসজ্জাও ছিল বিচিত্র ও বিলাসবহুল। রাজার জীবিত অবস্থায় যা কিছু প্রয়োজন, এমন কি পাত্র-মিত্র যান-বাহন সব কিছুই এর মধ্যে ছিল। এটা তৈরি করতে লেগেছিল আড়াই লাখ পাথর। কোন কোন পাথর হাজার মণের বেশী ভারী।

কেমন করে এত ভারী পাথরকে এত উঁচুতে তোলা হয়েছিল সে কথা ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে।

ধর্মীয় বিশ্বাসঃ মিশরীয়রা দেবদেবীর প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান ছিল। মিশরের যে সব দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সূর্যের দেবতা 'রা' বা 'রি' (Ra) হচ্ছেন প্রধান। বাজপাখীর মাথার উপর সাপের কুণ্ডলী পাকানো মুকুট—এই হল তাঁর মূর্তি। ইনিই হচ্ছেন পৃথিবীর আদি পুরুষ। মিশরের ধর্মীয় কথায় বলে—পৃথিবীর আদিতে ছিল শুধু জল, জলের উপর ভাসছিল মাত্র একটি ফুল, সেই ফুল থেকেই সূর্য দেবতা "রা" বেরিয়ে এসেছেন। "রা"-এর তিন ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলেদের নাম 'শু' (Shu), 'টেফনুট' (Tefnut) ও 'জেব' (Geb), মেয়েটির নাম 'নুট' (Nut)। শু, টেফনুট ও জেব উপরে দাঁড়ালো। তারা নুটকে তুলে ধরলো আকাশে। এই ভাবে জেব হল পৃথিবীর দেবতা আর নুট হলো আকাশের দেবী। জেব এবং নুটের চারটি সন্তান, ওরিসিস্ (Orisis) ও সেথ্ (Seth) হল ছেলে, আর আইসিস্ (Isis) ও নেফ্থিস্ (Nepthys) হল মেয়ে। জেবের পর পৃথিবীর রাজা হল ওরিসিস্। সে ভালভাবেই রাজ্য শাসন করল। তার বোন আইসিস্ তাকে রাজ্য শাসনে সাহায্য করতেন—তাই আইসিস্কে তিনি বিয়ে করলেন। সেথের ভারী হিংসা হল, সে ওরিসিস্কে হত্যা করে, খণ্ড খণ্ড করে কেটে মিশরের নানা জায়গায় পুঁতে দিল। মাথাটা আবিডস (Abydos) নামক স্থানে পোঁতা হয়েছিল। সেখানে একটি মন্দির তৈরি হয়েছিল। ঐ স্থান মিশর-বাসীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। আইসিস্ আর কি করবে ? স্বামীর মৃতদেহের অংশগুলি সংগ্রহ করে শেয়াল-মুখো দেবতা 'আনুবিসে'র (Anubis) কাছে গেল। তার সাহায্যে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনলো ; কিন্তু সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারলো না। মৃতের দেবতা হয়ে সে পাতালেই থেকে গেল। তার ছেলে 'হোরাস' (Horous) যুদ্ধে সেথ্কে হারিয়ে দিল। 'রা' তখন সেথ্কে নির্বাসিত করল। এইভাবে হোরাস রাজা হল।

'রা'ই মিশরবাসীদের প্রধান দেবতা—তিনি আলো আর

জীবন দান করেন। আইসিসের পূজাও মিশরে বহুকাল প্রচলিত ছিল। এছাড়া এখানে আরও অনেক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল।

এর আগে আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক কাল শুরু হবার আগে থেকেই মিশরের গ্রামবাসী প্রতীক বা চিহ্নের সাহায্যে নিজেদের পরিচয় দিত। কোন গ্রামের লোকদের চিহ্ন ছিল কোন পশু, পাখী, ফুল বা ফল। এই চিহ্ন বা 'টোটেম'কে তারা তাদের বংশের আদি পুরুষ বলে মনে করত ও তাদের পূজা করত।

মিশরীয়েরা পরলোকে বিশ্বাসী ছিল। এর পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। বহু অর্থব্যয় করে ও প্রচুর পরিশ্রম করে পিরামিড তৈরির মধ্য থেকেই সে কথা প্রমাণিত হয়েছে।

প্রধান বৃত্তিসমূহ : ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হবার আগে থেকেই মিশরের অধিবাসীগণের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষি। কৃষিকাজই এখানকার লোকের প্রধান কাজ ছিল। তা ছাড়া পশুপালন, গৃহনির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্র, কৃষির যন্ত্রপাতি, নৌকা, বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প এগুলিও প্রধান কাজ ছিল। এর অনেক পর এখানে রাজা এলেন। রাজকার্যে সাহায্যের জন্য মন্ত্রী, পারিষদ, পুরোহিত, সৈনিক, খালকাটার লোকজন, হিসাবরক্ষক, লেখক এদের কাজও শুরু হল। এই সব কাজে অনেক লোক লাগত। ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনেক লোক নিযুক্ত থাকতো। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে নদীপথে সাগরে পাড়ি দিত। এই সব জাহাজ চালাবার জন্য সুদক্ষ নাবিকের প্রয়োজন হতো।

মমি (মিশর)

রাজবংশ আরম্ভ হবার পর 'পিরামিড' তৈরি আরম্ভ হল। এই কাজের জন্য অনেক লোকের দরকার হতো, কাজও চলতো অনেক দিন ধরে। এতে যেমন হাজার হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন হতো তেমনি সুদক্ষ স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ারের দরকার হতো। স্থাপত্য

বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা না থাকলে এইরূপ বিরাট সৌধ নির্মাণ সম্ভব হত না। এ কাজেও অনেক লোকের প্রয়োজন হতো। পিরামিডের ব্যবহারের জন্য উন্নত ধরনের কাজেও অনেকও লোক নিযুক্ত থাকতো। অলঙ্কার তৈরির জন্য থাকতো স্বর্ণকার ও মণিকারগণ। রাজার প্রধান প্রধান কাজগুলি লিখে রাখা হতো প্যাপিরসের উপরে। লেখকের কাজেও কম লোক লাগতো না। লেখাপড়া শেখাবার জন্য নিশ্চয় অনেক লোক থাকতো। পিরামিডের গায়ে মিশরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের যে সকল চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় চিত্রশিল্পের চর্চাও খুব উন্নত হয়েছিল। মৃতদেহকে 'মমি' করে রাখার প্রথার মধ্যে আছে চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যার অনুশীলন। চিকিৎসা বিদ্যা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে প্রাচীন লেখা পাওয়া গেছে। এগুলিতে নানা রোগ ও চিকিৎসা প্রণালীর বর্ণনা আছে। এগুলি দেখে মনে হয়, অনেক মিশরবাসী এই বিদ্যায় নিযুক্ত ছিল। প্রাচীন মিশর জ্ঞানে-বিজ্ঞানেও অনেক উন্নত ছিল। গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতিতে এই সময়ে উন্নততর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই চর্চায় এবং প্রয়োজনে বহু মানুষ নিযুক্ত ছিল।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা

অবস্থানঃ মিশরে ও সুমের অঞ্চলে যেমন নদীর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষেও তেমনি সিন্ধুনদ ও তার শাখানদীগুলিকে ঘিরে এক উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে এখানে যে ধরনের সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল পৃথিবীর অন্য কোথাও তা হয়নি। একে প্রাচীন পৃথিবীর বৃহত্তম রাজ্য বলা যেতে পারে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংসস্তূপগুলি খুঁড়ে দুটি শহরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই খননকার্য করেছিলেন স্যার জন মার্শাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শহর দুটির নাম হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো। হরপ্পা শহর ইরাবতী নদীর তীরে, বর্তমান লাহোর থেকে একশো মাইল উত্তরে।

মহেঞ্জোদাড়ো সিন্ধুনদের তীরে, বর্তমান করাচী থেকে এর দূরত্ব দু'শ মাইল। সমগ্র এলাকাটাই এখন পাকিস্তানে।
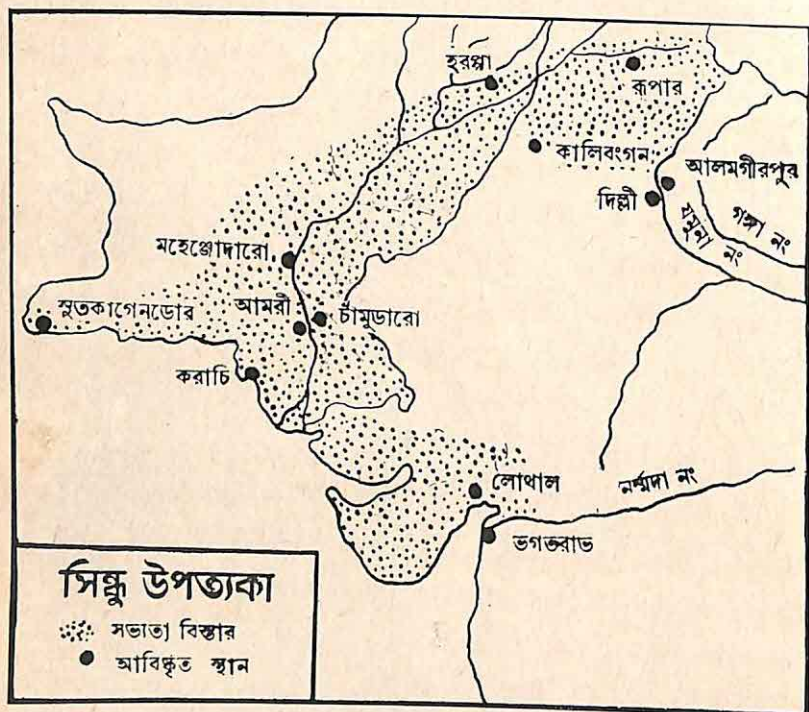
মহেঞ্জোদাড়ো কথার অর্থ 'মৃতের দেশ'। এখন এই জায়গাকে বলা হয় 'সিন্ধু প্রদেশের উদ্যান'। সিমলা পাহাড় থেকে আরম্ভ করে আরব সাগর পর্যন্ত ভূভাগে অনেক নগর, শহর, গ্রামগুলি গড়ে উঠেছিল। সব জায়গাটাই সিন্ধু নদের উপত্যকায় অবস্থিত বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে **সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা** (Indus Valley Civilisation)।

আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত : হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো শহরের ব্যবধান ৪০০ মাইলের মত। এর মাঝে আরো কতকগুলি ছোট শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি সবই পাওয়া গেছে মাটির উঁচু ঢিপির তলায় এবং দেখা গেছে শহরগুলি বেশ কয়েকবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। সিন্ধুনদের বন্যার ফলে সমগ্র অঞ্চলটাই ভেসে

যেত আর ঘরবাড়ীগুলি ধ্বংস হয়ে যেত। এর উপর আবার নতুন করে শহর গড়ে তোলা হতো। প্রত্যেকবারই শহরের গড়ন একই ধরনের। গোটা অঞ্চলে ছোট ছোট শহর ও মানুষের বাস থেকে মনে করা যেতে পারে যে সমগ্র উপত্যকাটি একই শাসনাধীনে ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী হরপ্পা। কারণ হরপ্পা অপেক্ষাকৃত বড় অথবা দুটি স্থানকেই শাসনকার্যের জন্য ব্যবহার করা হতো।

শহরগুলিতে বড় বড় বাড়ী, কোন কোনটা দোতালা, তিন তালাও ছিল। দোতালা বা ছাদে ওঠার সিঁড়ি ছিল প্রত্যেক বাড়ীতে। ছাদের জল যাতে বাইরে পড়ে তার জন্য ছাদে জীবজন্তুর মুখের আকৃতির নল লাগানো ছিল। বাড়ীগুলি সবই একই ধরনের ও একই মাপের পোড়া মাটির ইট দিয়ে তৈরি। শহরের মাঝখান দিয়ে ইট দ্বারা বাঁধান রাস্তা ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহর

এ ছাড়া এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে পোড়া মাটির পাত্র, জীবজন্তুর ও মানুষের মূর্তি। সুন্দর রং করা ও নক্সা আঁকা আছে সেগুলির গায়ে। অনেক সীলমোহরও পাওয়া গেছে, প্রত্যেকটিতে জীবজন্তুর ছবি আঁকা। এতে এক রকম লেখাও পাওয়া গেছে। এই লেখা এখানো কেউ পড়তে পারেনি। এর ফলে এই সভ্যতা সম্বন্ধে সঠিক কোন মন্তব্য করা খুবই কঠিন।

নগর-পরিকল্পনা ঃ কোন বড় বাড়ী, ব্রীজ প্রভৃতি তৈরি করতে গেলে প্রথমে প্ল্যান বা পরিকল্পনা তৈরি করতে হয়, কোন নতুন শহর তৈরি করতে গেলেও তাই করতে হয়। এই প্ল্যান বা নক্সা তৈরি করার কারণ কোন্‌খানে কেমন বাড়ী হবে, রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি কোথায় কোন্‌টা থাকবে আগে থেকে ঠিক করে নিলে কাজের অনেক সুবিধা হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো শহরের গঠন-প্রকৃতি দেখে মনে হয়

এমনি প্ল্যান বা পরিকল্পনা করে তার পর নির্মাণকার্যে হাত দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীর ঃ শহরের পশ্চিম দিকে দেখা যায় উঁচু প্রাচীর। সিন্ধু নদের বন্যা থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্যই বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো উভয় শহরেই এই প্রাচীর আছে। প্রাচীরের পরই রয়েছে অনেকগুলি বেশ বড় বাড়ী সারিবদ্ধভাবে সাজানো। নগরের শাসনকর্তারাই বোধহয় এখানে বাস করতেন। এর পরই আসল শহর।

রাজপথ ঃ শহরের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে প্রশস্ত রাস্তা, কোন কোনটা ত্রিশ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত। সমগ্র শহরটাকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলি ব্লক বা পাড়ায়। এই ব্লকগুলির আয়তন লম্বায় ১২০০ ফুট ও চওড়ায় ৮০০ ফুটের মত। দুটি শহরকেই এমনি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। বাড়ীগুলি সবই পোড়ামাটির ইট দিয়ে তৈরী, আকারে আমাদের ইটের মতই। চারকোণা উঠানকে ঘিরে বাড়ীগুলি সাজানো। একটি এমনি বাড়ীতে এক একটি পরিবার বাস করতো। দোতালা, তিনতালা বাড়ীও ছিল, বাড়ীর দরজা পেছনের দিকে। পথের দিকে জানালা নেই। ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়ি ছিল। ছাদ থেকে যাতে জল বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য নল লাগানো রয়েছে। বাড়ীর মধ্যে স্নানঘরও আছে। বাড়ীর ড্রেনগুলি রাস্তার ড্রেনের সাথে লাগানো আছে। এগুলি পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে গর্ত আছে, এর মুখ খোলা যেত। প্রত্যেক বাড়িতে আবর্জনা ফেলার জায়গা (ডাষ্টবিন) ছিল। রাস্তার ধারেও এই ধরনের আবর্জনা ফেলার জায়গা ছিল। সব বাড়ীর আকার সমান নয়, কোন কোনটি আকারে ছোট। শহরের প্রাচীরের গায়ে লম্বা ছোট ছোট কামরা-যুক্ত বাড়ী ছিল ; দেখতে কতকটা ব্যারাকের মত।

পানীয় জলের ব্যবস্থা ঃ পানীয় জলের জন্য প্রত্যেক বাড়িতে কূপের ব্যবস্থা ছিল। কূপের চারদিকের চাতাল ইট দিয়ে উঁচু করে বাঁধান। কূপগুলির পাশে কতকগুলি পোড়া মাটির পাত্র পড়ে আছে। সম্ভবতঃ এগুলিতে জল খাওয়া হত।

সাধারণ স্নানাগার ঃ শহরের প্রাচীরের পাশেই বিরাট একটা বাঁধান
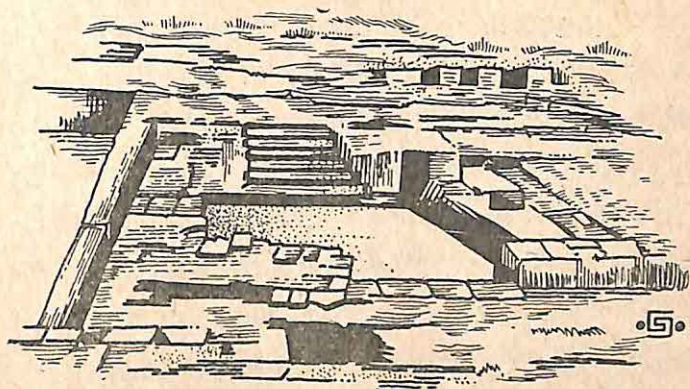
বৃহৎ স্নানাগার

জায়গা। লম্বায় ৪০ ফুট আর চওড়ায় ২৪ ফুট। এর গভীরতা আট ফুট। এতে স্নানের জল ধরে রাখা হত। জল বেরিয়ে যাবার পথও আছে।

রাজপ্রাসাদ ঃ মহেঞ্জোদাড়োতে রাজপ্রাসাদের মত খুব বড় একটা বাড়ী পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ বাড়ীটা ছোট ছোট কুঠরীতে ভাগ করা। আর একটি বড় বাড়ী পাওয়া গেছে ঠিক হলঘরের মত। এতে সুন্দর সুন্দর থাম আছে। খাদ্যশস্য মজুত করে রাখার মত শস্যাগার ও শস্য গুঁড়ো করা বা পেশাই করার জায়গাও পাওয়া গেছে। এর পেছনে আছে কামারশালা, সেখানে বাড়ীতে ব্যবহৃত নানা জিনিস তৈরি হত। ব্যবস্থা দেখে মনে হয় আমাদের শহরগুলিও এমন সাজানো গোছানো নয়।

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য সামগ্রী ঃ সিন্ধু উপত্যকা পলিমাটির দেশ। এখানকার লোকের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষি ও পশুপালন। খাদ্য-শস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল চাল, গম, বার্লি ও শাকসব্জী। পশুপালনেও এখানকার লোকেরা খুব দক্ষ ছিল। গৃহপালিত পশুর মাংসও এদের খাদ্য ছিল। এই নদীপ্রধান দেশে মাছের অভাব ছিল না। মাছও এদের খাদ্যতালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এখানে এক বড় জায়গায় খাদ্যশস্য গুঁড়ো করা হতো। সম্ভবতঃ এভাবে গম, যব প্রভৃতি গুঁড়ো করে খাবার প্রথা ছিল।

অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস : কৃষিকাজের জন্য তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী নানা যন্ত্রপাতি এখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করতো। যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্রোঞ্জের তৈরী তরবারি, কুঠার, তীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লোহার ব্যবহার এদের জানা ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ-কৌশলে এরা সুমেরীয়দের মত উন্নতি করতে পারেনি। এদের তৈরী কুঠার প্রভৃতি হাতিয়ারে বাঁট লাগাবার কোন ছিদ্র ছিল না। উপরের দিকে বাঁট হাতিয়ারের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। এখানকার লোকের বাড়ীতে উন্নত ধরনের আসবাবের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাঠের তৈরী বড়বাক্স, খাট, বেঞ্চ প্রভৃতি দেখা গিয়াছে। বাক্সে ব্রোঞ্জের তৈরী আংটা লাগানো থাকতো। কাঠের খোদাই করা চেয়ারও এখানে পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ এটা দু'হাজার বছরের আগেকার তৈরি।

বিভিন্ন অলঙ্কার
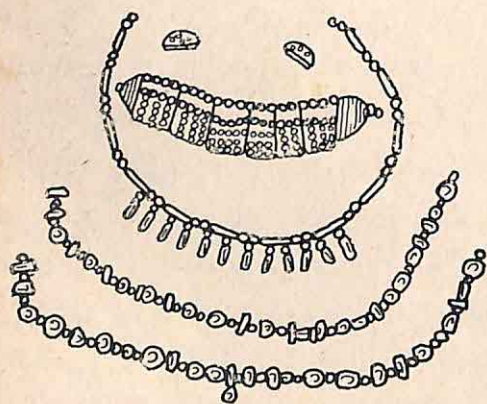
পরিধেয় হিসাবে সুতী, পশম ও উলের কাপড় এখানকার অধিবাসীরা ব্যবহার করতো। মেয়েদের পোষাক ছিল খুব ঝকঝকে। 'মিনি স্কার্ট' এর মত এক ধরনের ছোট জামা এরা গায়ে ব্যবহার করতো। পুরুষেরা ঢিলে জামা পরতো। এদের ডান কাঁধ খোলা থাকতো। মেয়েদের গায়ে সোনা, রূপোর গয়না থাকতো, সেগুলি নানা রঙের মূল্যবান পাথর ও চকচকে ঝিনুকের খোলা বসিয়ে তৈরী হত। এদের অলঙ্কারের নির্মাণ-কৌশল প্রশংসনীয়। ব্রোঞ্জের তৈরী আয়নাও এরা ব্যবহার করতো। মেয়েদের হাতে, গলায়, কানে, পায়ে নানারকম গয়না দেখা যায়। বাড়ির নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পোড়া মাটির বাসন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পোড়া মাটি ও তামা দিয়ে তৈরি নানা ধরনের খেলনাও প্রচলিত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য : সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নতি করেছিল। এখানকার তৈরী মাটির বাসন, অলঙ্কার, ধাতু নির্মিত নানা জিনিস মধ্য এশিয়ার বহু স্থানে পাওয়া গেছে। মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের সাথে এখানকার লোকদের লেনদেনের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। স্থলপথেই সম্ভবতঃ এই যোগাযোগে করা হত। যানবাহনের মধ্যে গরুর গাড়ীই প্রধান। গাড়ীর চাকাগুলি খুব শক্ত; আমাদের গাড়ীর চাকার মত রড লাগানো নয়। এগুলো ছিল নিরেট অর্থাৎ কোন ফাঁক নেই। জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন নিদর্শন এখানে পাওয়া যায় নি। যে দু'একটা নৌকার ছবি পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বড় নদী বা সাগরে পাড়ি দেওয়ার মত জাহাজ এখানকার লোকেরা তৈরী করতে পারেনি। স্থলপথ ছিল খুব দুর্গম। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য খুব কষ্ট স্বীকার করেই করতে হয়েছিল। এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য জন্মাতো। এই শস্য বদল দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চলতো। ব্যবসার কাজে এরা সীলমোহর ব্যবহার করত। ভারতবর্ষের ব্যবসার স্থানগুলির মধ্যে রাজপুতানার নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে তামার খনি ছিল। রাজপুতানা থেকে তামা আর ব্রোঞ্জ সিন্ধু উপত্যকায় আনা হতো। দাক্ষিণাত্য থেকে মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তা ও চকচকে ঝিনুক আনা হতো। পরস্য থেকে আনা হতো মণিমুক্তা আর রূপা। রপ্তানির মধ্যে সূতী কাপড় প্রধান। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এখানেই তুলার চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল। সূতীবস্ত্র এখান থেকে নানা অঞ্চলে পাঠানো হত।

হাতের কাজ : সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীগণ শিল্পকাজে খুবই উন্নত ছিল। কুমোরের চাকার সাহায্যে মৃৎপাত্র নির্মাণ এখানকার নিজস্ব শিল্পকীর্তি। সুন্দর সুন্দর মাটির বাসনের গায়ে রং করে নানা নক্সা আঁকা হত। পোড়া মাটি, তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী মানুষ ও জীব-জন্তুর মূর্তি এখানে অজস্র পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলো খুব সুন্দর ও নিখুঁত। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে ব্রোঞ্জের তৈরী নর্তকীর মূর্তি। কোমরে হাত দিয়ে পা বাঁকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে অজস্র সীলমোহর ও শিল্পকাজের

উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। সীলমোহরগুলি পোড়া মাটি, তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী। সীলমোহরগুলিতে নানা জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা আছে। ষাঁড়, মহিষ, বাঘ, হাতি প্রভৃতি মূর্তি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে অনেক লেখা, লেখাগুলি নানা সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় এখানকার লোকেরা লেখাপড়া জানতো। কিন্তু এই লিপিগুলি এখনো কেউ ঠিকমত পড়তে পারেনি। সীলমোহরগুলি সম্ভবতঃ রাজকার্যে ব্যবহার করা হত। বড় বড় ব্যবসায়ীগণও বোধ হয় সীলমোহর ব্যবহার করতো। এছাড়া মাটির, তামার ও ব্রোঞ্জের নানা খেলনাও এখানে পাওয়া গেছে।

পূজা-ধর্ম ঃ সুমেরীয়দের পূজা পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া যায় সে দেশের মন্দিরগুলিতে। মিশরীয়দের ধর্ম সম্বন্ধে পিরামিডে রাখা প্যাপিরাসের উপর লেখা আছে। সুমেরীয়দের রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা পুরোহিত সম্প্রদায় চালাতেন ; মিশরে রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা ছিল রাজার হাতে। সেখানেও পুরোহিতদের স্থান ছিল ; কিন্তু হরপ্পা বা মহেঞ্জোদাড়োতে শাসন-ব্যবস্থা কার হাতে ছিল তার কোন প্রমাণ নাই। এখানে কোন বড় মন্দির বা রাজপ্রাসাদ পাওয়া যায় নি। তবে মনে হয় এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় পুরোহিতদের স্থানই সবচেয়ে উঁচুতে ছিল। হরপ্পায় একটি নারী-মূর্তি পাওয়া গেছে। এই নারী-মূর্তি মাতৃপূজার কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেকের অনুমান প্রত্যেক গ্রামেই এই মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। গ্রাম-দেবতার পূজা এখনো আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এই মাতৃপূজা বা গ্রাম-দেবতার পূজা সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের কাছ থেকেই আমাদের দেশে এসেছে। সীলমোহরের উপর আঁকা আর একটা দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। এই দেবতা আসনে উপবিষ্ট। এর তিনটি মুখ আর মাথায় দুটি শিং আছে। একে ঘিরে আছে

সিন্ধু সভ্যতার দেবতা

ষাঁড়, গণ্ডার ও বাঘ। পায়ের কাছে আছে দুটি হরিণ। অনেক লোক এদের পূজা করছে এর ছবিও আছে। একে পশুপতি বা শিব বলে মনে করা হয়। এর থেকে মনে হয় সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা শিবের পূজা করতো। শিবের বাহন ষাঁড়। ষাঁড়ের ছবিও এখানে পাওয়া গেছে। এই ছবিগুলি দেখে অনেক পণ্ডিত মনে করেন এখানে শিব ও দুর্গা উভয়ের পূজাই প্রচলিত ছিল। ষাঁড়কে যে পূজা করা হত তার নিদর্শনও আছে। এছাড়া এরা প্রকৃতির পূজা করত বলে মনে করা হয়ে থাকে। মৃতের সৎকার করার দুটি উপায়ই এখানে প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা অথবা কবর দেওয়া হত। এখানে অনেক কবর পাওয়া গেছে। কবরে মৃত ব্যক্তির ব্যবহার করার জিনিসপত্রও আছে, অর্থাৎ প্রাচীন মিশরবাসীদের মত এরাও পরকালে বিশ্বাস করতো।

শিব পশুপতি—মহেঞ্জোদড়ো

সমাজ জীবন ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ সিন্ধু উপত্যকায় কি রকম সমাজ-ব্যবস্থা ছিল তা জানবার জন্য আমাদের দেখতে হবে তাদের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, বিলাসের উপকরণ প্রভৃতির দিকে। এখানে যে দুটি খুব বড় বাড়ী পাওয়া গেছে সেগুলি শাসনকর্তার আবাস গৃহ বলে মনে হয়। বাসগৃহগুলির কোন কোনটা আকারে বেশ বড়। এগুলির ভিতর নানা আসবাবপত্রও আছে। আবার কোন বাড়ী আকারে ছোট। এখানে আসবাবের ব্যবস্থা সামান্য। আর এক শ্রেণীর বাড়ী পাওয়া গেছে—লম্বা টানা বাড়ী, একে অনেক ছোট ছোট কামরায় ভাগ করা হয়েছে।

এইগুলি দেখে মনে হয় এখানে তিন শ্রেণীর মানুষ বাস করত। শাসক-শ্রেণী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যবসায়ীগণ প্রথম শ্রেণীর লোক। এরা বিলাসবহুল বা আরামের জীবন যাপন করতেন।

তারপরের শ্রেণীতে পড়ে ভাল চাষী, ব্যবসায়ী ও শিল্পীগণ। এদের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল না। লম্বা ব্যারাক জাতীয় বাড়ীতে বাস করতো কুলী বা মজুর শ্রেণীর লোকেরা, এরা দাসও হতে পারে। এদের জীবনযাত্রা খুব সাধারণ ছিল।

চীন দেশ

চীন দেশেও প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। চীনের প্রসিদ্ধ নদী উপত্যকায় এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল। প্রধানতঃ হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে সেদিনের মানুষ বসতি বিস্তার করেছিল। চীনের প্রাচীন কাহিনী অনুসারে হোয়াংহো নদীর উত্তর উপকূলের উর্বর ভূমিতে মানুষ প্রথমে বাস করতে আরম্ভ করে। ২৮০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই রকম কৃষিভিত্তিক অনেক গ্রাম এখানে গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের কাংসু ও সেনসি নামক স্থানগুলিও মানুষের বসবাসের উপযোগী। এই অঞ্চলের ভূমিও কৃষিকাজের উপযোগী ছিল। এখানে অনেক মানুষ এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে।

ইয়াংসিকিয়াং নদীর হোনান অঞ্চলেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নদীর তীরে হোপি প্রদেশে পেপিং নামক স্থান প্রাচীন কাল থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বহু কাল পর্যন্ত পেপিং চীন দেশের রাজধানী ছিল। এই উপকূলের সান্টুং থেকে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত স্থানে ও প্রাচীন কালেই মানুষ বসবাস করতে শুরু করে। কন্‌ফুসিয়াস, মেনসিয়াস প্রভৃতি চীনের মনীষীগণ এই অঞ্চলের জন্ম-গ্রহণ করেন। ইয়াংসিকিয়াং-এর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর থেকে তিব্বতের সীমানা পর্যন্ত স্থান অসমতল। এই অঞ্চল কৃষিকাজের উপযুক্ত ছিল না। এখানেও মানুষ বাস করতে আরম্ভ করেছিল, তবে এদের জীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। অনেক প্রাচীন কাল থেকে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপরের দিক থেকে প্রাচীন চীন ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

প্রাচীন কালের চীন: কৃষিকাজের উন্নতির সাথে সাথে চীনে গ্রামের সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল। এমনি কতকগুলি গ্রামের একজন নেতা থাকতো। এই নেতা বা রাজাদের যিনি বাহু ও বুদ্ধিবলে নিজের অধীন আনতে পেরেছিলেন তাঁকেই বোধহয় চীনের সম্রাট বলা হত। প্রাচীন চীন দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে এইরূপ সম্রাটের উল্লেখ আছে। এই সম্রাটদের মধ্যে **ফুসি** (Fu Hsi), **সেন নাং** (Shen-Neang) এবং **হোংটি** প্রধান। হোংটির নাম অনুসারে হোয়াংহো নদীর তীরের কিছু স্থানের নাম রাখা হয়েছিল বলে মনে হয়।

২২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে 'হিয়া' (Hsia) রাজবংশের রাজাগণ চীন দেশে রাজত্ব করতে শুরু করেন। এঁদের মধ্যে উ (Yu) প্রসিদ্ধ। চীনের উপকথায় এঁর নাম পাওয়া যায়।

হিয়া রাজবংশের সময়েই চীনে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহারও এই সময়ে আরম্ভ হয়। মিশর, সুমের ও ভারতের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতু চীন দেশে কম পাওয়া যেত। উপরোক্ত দেশগুলি থেকেই এগুলি আনতে হত। এই যোগাযোগের ফলে ধাতুর কাজের কলাকৌশলও চীনবাসী শিখে ফেলে। কুমোরের চাকাও চীনবাসীরা নিজেরাই তৈরি করতে পেরেছিল। এর ফলে, গাড়ী, রথ ও ঘোড়ায় টানা লাঙ্গলের ব্যবহারও এখানে প্রচলিত হয়েছিল। চীন-বাসীরা খুব প্রাচীন কাল থেকে রেশমের কাপড় তৈরি করতে শিখেছিল। গুটি পোকার চাষ করে রেশম তৈরি করতে অন্য কোন দেশের লোকেরা জানতো না। বাধ্য হয়ে চীনদেশ থেকে রেশম আনতে হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুব দুর্গম ছিল।
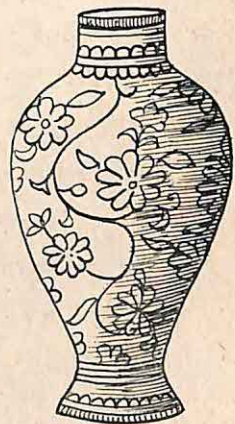
রঙীন চীনামাটির পাত্র

পৌরাণিক কাহিনী: প্লাবন: চীনের প্রাচীন জীবনধারায় আমরা

বহু পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাই। জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে এগুলি গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবন-যুদ্ধের বহু কাহিনী এর বিষয়বস্তু। হোয়াংহো নদী যেমন চীনের প্রাচীন সভ্যতা বিকাশে সাহায্য করেছিল, তেমনি এর বিধ্বংসী প্লাবন মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করেছিল। এই প্লাবনকে কেন্দ্র করে আছে নানা পৌর্যাণিক কাহিনী। হোয়াংহো নদীতে ভীষণ প্লাবনের ফলে সমগ্র চীন ভেসে যেত। গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র ভেসে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। চীনের এই সময়কার ইতিহাস বন্যার সাথে সংগ্রামের ইতিহাস।

দাগ কাটা কচ্ছপের খোল

কোন কোন ক্ষমতাবান নেতা মাটিতে গর্ত করে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে মানুষের জীবনকে নিরাপদ করেন। এই জলের সাহায্যে কৃষিকাজ চলত। কিন্তু সমগ্র চীনকে যিনি প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন তিনি হলেন মহান রাজা 'উ' (Yu)। তিনি খুব বুদ্ধিমান ও স্থাপত্য বিত্যায় পারদর্শী ছিলেন বলে মনে হয়। চীনদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, মহান 'উ' না থাকলে মানুষ মাছ হয়ে যেত—অর্থাৎ জলে সাঁতার কেটে বাস করতে হতো। হোয়াংহোর প্লাবন থেকে চীনকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে তাঁকে লোকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। তাঁর বংশধরেরাও তাঁর মতই পূজা পেতেন।

চীনদেশে লেখার প্রচলনও এই সময়েই হয়েছিল। এই লিপি চীন দেশের নিজস্ব প্রথায় পাথর ও কাছিমের খোলায় লেখা হতো। তারপর উন্নত ধরনের লেখার প্রচলন হয়।

নদীমাতৃক সভ্যতার লক্ষণগত ঐক্য

আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর নানা স্থানে নদীর তীরবর্তী ভূমিতে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। টাইগ্রিস, ইউক্রেটিস, নীল, হোয়াংহো, সিন্ধু নদ-নদীর উপত্যকাগুলিতে যে সকল সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তা যুগ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে

আজও তাদের স্মৃতি রক্ষা করে চলেছে। এই সব সভ্যতার ভূমিভাগের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও এদের বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষণগত ঐক্য রয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রণালীতে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এখন আমরা সে কথাই আলোচনা করব।

নদীতীরে সভ্যতার বিকাশের প্রধান কারণ হল জল। জলই মানুষের জীবন, জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। বাঁচার তাগিদেই মানুষ চাষবাস ও পশুপালন শুরু করেছিল। চাষের জন্য চাই উর্বর ভূমি আর পশুপালনের জন্য চাই চারণ ক্ষেত্র। এ দুটির অভাব নদীর উপকূলে ছিল না। নীলনদ, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু ও তার শাখা-প্রশাখা, এবং হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং নদীতে বন্যার ফলে উপকূলে প্রচুর পলিমাটি পড়ে স্থানগুলিকে চাষের কাজের উপযোগী করে তুলেছিল। বাঁধ ও খালের সাহায্যে দূরবর্তী অঞ্চলেও জল নিয়ে যাওয়া ও চাষের কাজ করা সম্ভব হ'ত। তৃতীয়তঃ বাড়িঘর তৈরী, মাটির বাসন তৈরীর পক্ষেও পলিমাটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চতুর্থতঃ কতকগুলি প্রয়োজনীয় ফল যেমন খেজুর, জলপাই, ডুমুর প্রভৃতি স্থায়ী গাছ এই সব অঞ্চলে ছিল। গাছের টানেই এই অঞ্চলের সাথে মানুষ মিতালী করেছিল। গাছের ফল ও কাঠ দুটিই এদের খুব কাজে লাগতো। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ও অন্যান্য দেশের লোকজনের সাথে যোগাযোগের সুযোগও নদীপথে কম ছিল না। নদীতে মাছ ধরেও সেকালের লোকে খাদ্যের সংস্থান করতো। উপরোক্ত অঞ্চলের জলবায়ুও মানুষের বসবাসের অনুকূল ছিল।

সামাজিক জীবনধারা : বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষ দল বাঁধতে শিখেছিল। আত্মরক্ষা ও শিকারের জন্য তারা দল বেঁধে গুহায় বাস করতো। ছোট ছোট গ্রাম গড়ে ওঠার পরও দল বেঁধে গ্রামে এক এক অঞ্চলে বাস করত। এই ভাবে অনেক গ্রাম ও অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিল। এরা যখন কোন পশু শিকার করে আনতো, অথবা কিছু বনের ফল মূল কুড়িয়ে জড় করতো তখন গ্রামবাসীরা সকলে তা ভাগ করে খেত। তারপর কৃষিকাজ ও

পশু পালনের ফলে যে ফসল, মাংস ও দুধ পাওয়া যেত তা সবাই ভাগ করেই খেত। জমির কোন ব্যক্তিগত মালিক ছিল না—পশুর বেলায়ও একই কথা। মানুষের নিজের বলতে ছিল তার হাতিয়ার, তাও তার মরার সময় তার সাথেই কবরে দিয়ে দেওয়া হতো। কাজের যা কিছু ভাগাভাগি ছিল তা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে। মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীর কাজ করত, পুরুষেরা করত চাষ-বাস, শিকার প্রভৃতি। শস্যের ফলন যখন বেড়ে গেল তখন উদ্বৃত্ত ফসল রাখার ব্যবস্থা হলো। তাও গ্রামবাসী সকলের সম্পত্তি বলে মনে করা হত। এর পরে মানুষ নানা কাজ শিখলো, যেমন মাটির বাসন তৈরী, পাথর ও ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র তৈরী, বড় ঘর তৈরী, লেন-দেনের কাজ, নৌকা চালানো প্রভৃতি। সবাই তো আর সব কাজ করতে পারে না—তাই কাজের নির্দিষ্ট ভাগাভাগি হয়ে গেল। যারা কৃষি কাজ করতো ফসল তাদের কাছেই থাকতো—আর যারা হাতের কাজ করতো তারা তার বিনিময়ে ফসল পেত। এই ভাবে চাষী ও মজুরের সৃষ্টি হল। এর পর হলো পরিবারের সৃষ্টি। বাবা, মা, আর ছেলেমেয়ে নিয়ে এক একটি পরিবার এক একটি বাড়ীতে বা কতকগুলি বাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করলো। এই ভাবে কয়েকটি পরিবার নিয়ে এক একটি গ্রাম সৃষ্টি হয়। তখনকার লোক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি এগুলিকে দেবতার অভিশাপ বলে মনে করতো। দেবতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য নানা তন্ত্র-মন্ত্র জানা একদল লোক ছিল। এরা হলো পুরোহিত। কৃষিকাজ বা কোন হাতের কাজ এদের করতে হতো না। গ্রামবাসীদের নিজের নিজের 'টোটেম' বা বংশের আদি পুরুষ ছিল কোন পশু, পাখী, গাছ বা ফুল। এদের পূজা প্রচলিত ছিল। গ্রামবাসীদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদও হতো। এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের লোকদের মারামারি ও ঝগড়ার অভাব হতো না। এইভাবে রক্ষী দল, সৈন্যদল, নেতা ও সর্দারের সৃষ্টি হল গ্রামে গ্রামে, অঞ্চলে অঞ্চলে। অনেকগুলি অঞ্চলকে নিজের অধীনে আনলো কোন কোন শক্তিমান নেতা—এরা পরে এক এক অঞ্চলের রাজা হয়ে বসল।

অর্থনৈতিক জীবনধারা : রাজা তার অধীনস্থ ছোট ছোট দলের সর্দারদের সাহায্যে সমগ্র অঞ্চলটা অধিকার করত। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে তার রাজ্য। সেই অঞ্চলের সমস্ত জমিও তারই দখলে এল। অধীনস্থ বড় বড় সর্দার বা নেতাদের মধ্যে তিনি জমি ভাগ করে দিতেন। তারা আবার চাষবাসের জন্তে ছোট চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করে দিত। কোন কোন দেশে রাজাই হতো প্রধান। অন্যান্য আর সকলে, যেমন পুরোহিত, সৈনিক প্রভৃতি রাজার অধীনে থাকতো। তার ইচ্ছামত দেশ শাসন হতো! মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের রাজাই ছিল প্রধান। কিন্তু সুমেরীয় অঞ্চলে পুরোহিতগণই ছিল প্রধান। সিন্ধু অঞ্চলে কি ধরনের শাসন-ব্যবস্থা ছিল তা জানা যায় না। এইভাবে যে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলো, তাতে ভূমি ও পশু সম্পদের উপর মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার এল। এই অধিকার পুরুষানুক্রমিক হল। অর্থাৎ বাবা বা মা মারা গেলে তার সম্পত্তি ছেলেদের অধিকারে এল। সমাজে শ্রেণীবিভাগের সূত্রপাতও আরম্ভ হল। রাজা, সামন্ত, বড় বড় নেতা বা সর্দার যারা রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতো তারা এবং পুরোহিত, উচ্চ পদের রাজকর্মচারী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে এল। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে এদের কোন কাজ ছিল না। এরা আরামে বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এলো বড় চাষী, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কারিগরগণ। চাষীগণ চাষের ফসলের অধিকারী ছিল, কিন্তু রাজাকে তার প্রাপ্য কর রূপে শস্য দিতে হতো। ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পীগণ যোগ্যতা অনুসারে রাজার সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে বা চাষীর সাথে বিনিময় করে খাদ্য শস্য পেত। দৈনিক মজুরগণ হলো সব চেয়ে শেষের শ্রেণীর লোক। দৈনিক পরিশ্রমের মজুরী এরা যা পেত তাই দিয়ে তাদের সংসার কোন উপায়ে চলতো। যুদ্ধের বন্দীগণ ছিল দাস পর্যায়ের। খাবার ও থাকার বিনিময়ে তারা রাজার বা বড়লোকের বাড়ীতে ক্রীতদাসের মত থাকতো। এদের জীবন প্রায় পশুদের মতই ছিল।

অনুশীলনী

১। প্রাচীন সভ্যতা বলতে কি বুঝ? পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

২। মেসোপটেমিয়া কোথায়? এখানে যে সভ্যতা গড়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। সুমেরীয়গণের কৃতিত্ব বিষয়ে যা জান লিখ।

৪। মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেমন ছিল? সেই সময়কার মানুষের বৃত্তি কি কি ছিল?

৫। মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্যের কি রকম ব্যবস্থা ছিল? এই সময়কার যাতায়াত কেমন ছিল?

৬। মিশরকে প্রাচীন সভ্যতায় অন্যতম কেন্দ্র বলা হয় কেন? মিশরীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে একটি বিবরণ দাও।

৭। প্রাচীন মিশরের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান বল।

৮। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় পুরোহিত, সৈনিক ও খাজনা আদায়-কারীদের বিষয়ে কি জান লিখ।

৯। পিরামিড কি? কখন এই পিরামিড তৈরি হয়? এর পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? বর্তমানে কি পিরামিড দেখা যায়?

১০। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

১১। সিন্ধুনদ কোথায়? কখন এই নদের তীরে সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল? এই সভ্যতার প্রধান উপকরণ কি?

১২। সিন্ধু সভ্যতা কখন আবিষ্কৃত হয়েছিল? কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল? সিন্ধু সভ্যতার নগরবিন্যাসের বিবরণ দাও।

১৩। সিন্ধুসভ্যতার শিল্পকর্ম, বাণিজ্য ও পূজাপার্বণ বিষয়ে যা জান লিখ।

১৪। সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য, সামগ্রী, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্নানাগার সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও।

১৫। সিন্ধু সভ্যতায় সামাজিক কাঠামো কেমন ছিল?

১৬। প্রাচীন চীন সভ্যতা সম্বন্ধে যা জান লিখ।

১৭। হোয়াংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং-এর উপত্যকায় কি ধরনে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল? এ বিষয়ে যা জান বল।

১৮। চীনে বন্যা সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা দাও।

১৯। নদীমাতৃক সভ্যতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের আলোচনা কর।

২০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—

(ক) নদীমাতৃক সভ্যতা কাকে বলে ?

(খ) মেসোপটেমিয়াকে "দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ" বলা হয় কেন ?

(গ) উর শহর কোথায় ? এখানের ধ্বংসাবশেষ থেকে কি পাওয়া গেছে ?

(ঘ) ফেরাও কাকে বলে ? এদের কাজ কি ?

(ঙ) পিরামিড তৈরীর আসল উদ্দেশ্য কি ?

(চ) সিন্ধু সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল ?

(ছ) 'মমি' কাকে বলে ? কোথায় মমি তৈরী হত ?

২১। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :—

(ক) পিরামিড তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজন হত—তিন জন শ্রমিক/হাজার হাজার শ্রমিক।

(খ) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত—মিশর/মেসোপটেমিয়া।

(গ) মিশরের রাজাকে বলা হত—ফেরাও/মেনেস।

(ঘ) মিশরবাসীদের প্রধান দেবতার নাম—রা/হোরাস।

(ঙ) মহেঞ্জোদাড়ো এখন অবস্থিত—ভারতে/পাকিস্তানে।

২২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) —নীলনদের দান বলা হয়।

(খ) সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত লিপির নাম—।

(গ) মহেঞ্জোদাড়ো কথার অর্থ হল — দেশ।

(ঘ) ইয়াংসিকিয়াং নদী — অবস্থিত।

(ঙ) সুমেরীয় সভ্যতায় দাসগণের স্থান ছিল —।

(চ) মিশরে আবিষ্কৃত খেলার পদ্ধতির নাম —।

— — —

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহ যুগের সমাজ

ক. ব্যাবিলন
খ. মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার
গ. ইরাণ
ঘ. ইহুদি জাতি

লোহা আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার ও প্রভাব : লোহার আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। মাটি হতে লৌহ-প্রস্তর সংগ্রহ করে তা আগুনে গলিয়ে লোহা বার করার মধ্যে যথেষ্ট কৌশল রয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষের লোহার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। লোহা হয়তো তারা দেখেছিল, তবে ব্যবহার জানতো না। সম্ভবত ৩০০ বছর আগে ইউরোপের লোকেরা লোহার কাজ শিখেছিল। এশিয়া মাইনরের লোকেরা এর কিছু আগেই লোহাকে আকার দিয়ে যন্ত্রপাতি বানাতে শিখেছিল। এভাবে খুব বেশী হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি তৈরি করা যেত না ; সুতরাং মানুষের সমাজব্যবস্থায় খুব বেশী পরিবর্তন আসেনি।

১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দকে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের শেষ বলে ধরা হয়। এর পর থেকেই লৌহযুগ বা সভ্যতার যুগ আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে।

সুমের, মিশর এমন কি সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলেও যখন তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ চলছিল, সেই সময় 'হিটাইট্' জাতির লোকেরা লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছিল। এর ফলে মিশর-বাসীকে যুদ্ধে হারান তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। হিটাইট্রা লোহা থেকে অস্ত্র তৈরীর কৌশল অনেকদিন গোপনে রেখেছিল। এদের কাছ থেকে অ্যাসিরিয়ার অধিবাসীরা এই কৌশল শিখে ফেলেছিল। এর ফলেই তাদের পক্ষে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এর পর লোহার ব্যবহার ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক ও রোমানগণ এর ব্যবহার শিখে এর প্রয়োগের সুযোগ পায়।

লোহার অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির আবির্ভাব মানুষের সমাজ জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। লোহার হাতিয়ার তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার থেকে অনেক উন্নত ছিল। এটা যেমন দীর্ঘস্থায়ী হতো, তেমনি এতে নতুন করে ধার দেওয়াও চলতো। প্রথম দিকে লোহাকে খুব মূল্যবান ধাতু বলে মনে করা হতো, লোহার মুদ্রারও প্রচলন হয়েছিল অনেক দেশে। কিছু দিনের মধ্যে লোহা দিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট যন্ত্র তৈরি হতে আরম্ভ হল; সংখ্যায় এগুলি খুব বেশী ছিল না—যেমন কিলক, লিভার, চাকা, কপিকল, রেঁদা প্রভৃতি। বর্তমান যুগের উন্নততর যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এগুলি সংযোগের ফলেই। এগুলি দিয়ে মানুষ সহজে অনেক কষ্টসাধ্য জিনিস তৈরি করতে পেরেছিল।

রাজশক্তির বিকাশঃ নদী-উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমিগুলিতে যখন নতুন নতুন গ্রাম ও শহরের সৃষ্টি হচ্ছিল এবং সে অঞ্চলের লোকেরা যখন সুখে শান্তিতে বসবাস করছিল, সেই সময় অপেক্ষাকৃত অনুর্বর পার্বত্য ও উষর মরুভূমি অঞ্চলের কিছু কিছু লোক দল বেঁধে বাস করছিল। এরা ছিল যাযাবর। এদের কোন স্থায়ী বসতি ছিল না বললেই চলে। শিকারই ছিল এদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়; যদিও কিছু পশু তাদের সাথে থাকতো। এরা কৃষিকাজ করত না। সুমের, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলের সমৃদ্ধ গ্রামগুলিতে প্রায়ই এরা হানা দিত, আর লুটপাট করে ফসল, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি নিয়ে যেত। এদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ, কদাকার, কিন্তু এদের সাহস, শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল খুব বেশী। সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত শান্ত-শিষ্ট লোকেরা এদের সাথে পেরে উঠত না। প্রায়ই এদের সাথে সমৃদ্ধ অঞ্চলবাসীদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। সম্ভবতঃ এই যাযাবর যোদ্ধারা লোহার অস্ত্র তৈরি করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল। সেই অস্ত্রের সামনে তাম্র-ব্রোঞ্জের যুগের লোকেরা দাঁড়াতে পারত না। ক্রমে এরা দেখলো যে কোন অঞ্চল লুট করে শস্য সম্পদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার চাইতে সমস্ত অঞ্চলটা দখল করলেই বেশী লাভ। এদের বড় বড় সর্দার

বা নেতারা সেইজন্য অনেকগুলি যাযাবর দলকে একত্র করে কোন বড় অঞ্চলে হানা দিত। সেই অঞ্চলের লোকদের যুদ্ধে হারিয়ে সেখানকার মালিক বা প্রভু হয়ে বসত। সমগ্র এলাকাটাই হত তাদের লুটের মাল। পরাজিত লোকেরা ভয়ে এদের সামনে উপহার উপঢৌকন নিয়ে হাজির হত; এদের হুকুম তামিল করতো। এই দস্যুসর্দার ক্রমে রাজা হয়ে বসল, এদের ছেলেরা হলো রাজপুত্র। এদের অধীনে যে সব ছোট সর্দার থাকতো তারাও গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠল। রাজা পাত্রমিত্র সমেত বিজিত অঞ্চলের প্রভু হয়ে এদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, এমনকি ধর্মের সাথেও পরিচিত হলো। বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে এরা বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করল। কিন্তু এদের বহুদিনের অভ্যাস—শিকার করা ছাড়তে পারল না। এরা মাঝে মাঝে শিকারে বেরুতো; ঘোড়দৌড়, রথ চালনার প্রতি-যোগিতা ও খোলা মাঠে ক্রীড়ানুষ্ঠানে এরা খুব আনন্দ পেত। হাতের কাজ—বিশেষ করে চাষের কাজকে এরা ঘৃণার চোখে দেখতো। এইভাবে কর্মহীন বিলাসী রাজা ও রাজ-অমাত্য এবং খেটে খাওয়া চাষী বা মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি হল। কিছুদিন এভাবে বিলাসব্যসনে কাটার ফলে যখন এরা শৌর্যবীর্য হারাতে থাকলো, তখন হয়তো নতুন কোন যাযাবর গোষ্ঠীর নেতা এসে এদের হাত থেকে রাজ্যটা কেড়ে নিয়ে নিজেই রাজা হয়ে বসত। এই ভাবে নতুন নতুন অনেক রাজ্যের ও রাজার সৃষ্টি হল। তার সাথে সৃষ্টি হল একদল লোক যাদের কাজ শুধু রাজার কাজে সাহায্য করা। এদের গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে ধরা যেতে পারে।

ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার উত্তর দিকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ব্যাবিলন নগর। এর চারদিককেই ব্যাবিলোনিয়া বলে। ব্যাবিলোনিয়ার দুটি ভাগ—সুমের ও অকাদ। সুমেরের কথা তোমরা পড়েছ। এখন ব্যাবিলোনিয়ার কথা আরম্ভ

করছি। এই অঞ্চলের এক শক্তিমান রাজা ছিলেন। তিনি সুমের ও অক্কাদ রাজ্য দখল করে খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দের পূর্বেই ব্যাবিলোনিয়া রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনিই এখানকার প্রথম রাজা। সুমের রাজ্য জয় করলেও এখানকার সভ্যতা ধ্বংস করা হয়নি।

কৃষি ঃ মিশরের সভ্যতা যেমন নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এখানেও তেমনি নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মিশর যেমন নীলনদের বন্যায় প্লাবিত হতো এখানে তা হতো না। ব্যাবিলনও কৃষিপ্রধান দেশ। এখানকার অধিবাসীরাও কৃষির উপরই নির্ভর করত। এখানে কৃষির উন্নতি বিধান করা হয়েছিল সেচব্যবস্থার মাধ্যমে। সমগ্র চাষের এলাকায় খালের সাহায্যে জল আনতে হতো। এখানকার লোকদের ধারণা "মারডুক" নামে জলের দেবতা এই সেচ-প্রথার আবিষ্কার করেন। রাজারাও খাল কাটা ও খালের মেরামতের দিকে দৃষ্টি দিতেন। এর ফলে এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হত। উদ্বৃত্ত শস্য লাগতো ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ছিল গম, বালি, জোয়ার প্রভৃতি। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজার প্রাপ্য।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাবিলন খুব উন্নতি করেছিল। মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও অন্যান্য সভ্য অঞ্চলের সাথে লেনদেনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চলত। জলপথে নৌকার সাহায্যে, স্থলপথে উটের পিঠে বোঝা চাপিয়ে ব্যবসায়ীগণ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এখানে এক নতুন প্রথার প্রচলন ছিল—কতকটা আমাদের ব্যাঙ্কের মত। পোড়া মাটির স্লেটের উপর কিউনিফরম অক্ষরে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হতো—তাতে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকের সহি থাকতো। এই লেখা দেখিয়ে মাল দেওয়া-নেওয়া চলত।
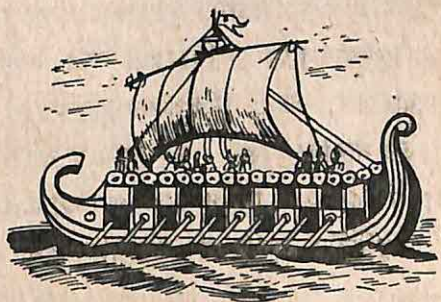
ফিনিসিয় জাহাজ

মন্দির ও পুরোহিতঃ সেই সময়কার পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশগুলির মত এখানেও পুরোহিতদের প্রাধান্য কম ছিল না। এখানকার প্রধান দেবতা মারডুক। খুব শক্তিশালী দেবতা—কতকটা আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রের মত। সুমেরের জিগ্‌গুরাটের মত এর মন্দিরও ছিল খুব বড়। অন্যান্য দেবতা কতকটা সুমেরীয়দের মতই। যেমন চাঁদের দেবতা **নানার**; সূর্যের দেবতা **সামাস**; দেবতার প্রাধান্য মানেই পুরোহিতদের প্রাধান্য। দেশবাসীর কাছে পুরোহিত খুব সম্মানের ব্যক্তি ছিলেন। রাজারাও এঁদের সম্মান দেখাতেন; কারণ মন্দিরের জমিগুলির আয় থেকে এঁরা খুব ধনবান হয়ে উঠেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আরম্ভ করে সব কাজেই রাজাকে তাঁরা পরামর্শ দিতেন। তা ছাড়া দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারেও এঁদের হাত ছিল।

শিক্ষা-সংস্কৃতিঃ হামুরাবি এখানকার শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি এখানকার ষষ্ঠ রাজা ছিলেন। সমগ্র ব্যাবিলোনিয়াকে তিনিই প্রথমে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এর আগে থেকেই এখানকার লোক শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক উন্নত হয়েছিল। এরা লেখার জন্য নূতন লিপি তৈরি করেছিল। সুমেরীয় লিপি থেকে এটা অনেক উন্নত হলেও সুমেরীয় লিপিকে তারা ধ্বংস করেনি। সুমেরীয় লিপি পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মিশরের লোকদের সাথে পরিচয়ের ফলে এখানে গণিতের খুব উন্নতি হয়েছিল। সময় নিরূপণের জন্য এরা সূর্যের ছায়া ও জলের ঘড়ির সাহায্য নিত। ৬০ মিনিটে ঘণ্টাকে ভাগ করা হত ও বৃত্তের পরিধি যে ৩৬০ ডিগ্রি তাও এরা জানতো।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার এখানেই স্থাপিত হয়েছিল। সে গ্রন্থাগারে আমাদের মত কাগজে ছাপানো বই থাকতো না, মিশরের মত প্যাপিরাসের উপরও এরা লিখত না। এরা লিখত মাটির ফলক বা স্লেটে। একে পুড়িয়ে স্থায়ী করে রাখা হত। স্থায়ী সৈন্যবাহিনীও এখানে প্রথম সৃষ্টি হয়। বড় বড় সৈনিকদের জমি দেওয়া হতো। এর ফলে ব্যাবিলনে নতুন এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হয়েছিল।

হামুরাবি শুধু বীরই ছিলেন না, রাজ্যের নানা উন্নতি বিধানও করেছিলেন। জলসেচের উন্নতি, নানা দেব-মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কাজও তিনি করেছিলেন। ব্যাবিলন শহরের চারদিকে উঁচু প্রাচীর তুলে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। তাঁর সময়ে ব্যাবিলন সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছিল।

হামুরাবির আইনের সংকলনে প্রতিফলিত সমাজ-ব্যবস্থা ঃ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন হামুরাবির কোড বা আইন সংকলন। কালো পাথরের স্তম্ভের উপরে লিখিত এই আইনগুলি প্যারিসের যাদুঘরে আছে। এরই একটি নকল রয়েছে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। স্তম্ভের গায়ে আঁকা আছে সম্রাট হামুরাবি সূর্যদেবতা সামাসের কাছ থেকে আইনগুলি গ্রহণ করছেন। কিউনিফরম লিপিতে লেখা এই আইনগুলি ২৮০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আইনগুলি খুব কঠোর হলেও সময়োপযোগী ও সকল স্তরের লোকের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

হামুরাবি

এই আইন অনুসারে কোন লোক যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি করে, তবে তাকে ফেরৎ দিতে হবে ত্রিশগুণ; যদি সে সাধারণ ব্যক্তির বাড়ী থেকে কিছু চুরি করে তা হলে দশগুণ ফেরৎ দিলেই হবে।

কোন বাড়ী ভেঙ্গে পড়ার ফলে যদি বাড়ীর মালিকের মৃত্যু হয়, তা হলে যে বাড়ী তৈরি করেছে তার মৃত্যুদণ্ড হবে; আর যদি বাড়ীর মালিকের ছেলে মারা যায় তা হলে যে বাড়ী তৈরি করেছে তার ছেলের মৃত্যুদণ্ড হবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাবে। অন্য কোন সভ্য দেশে সে সময়ে মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না। হামুরাবি ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি হস্তান্তর প্রভৃতি

বিষয়েও আইন করেছিলেন। লিখিত দলিল ছাড়া কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করা যেত না। কাজেই মজুরীও আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এমন কি দাসগণও তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হত না। আইনগুলি যাতে ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় তার উপর তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তার শাসনের ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা এসেছে, প্রজাগণ সম্প্রীতিতে বাস করছে তাও তিনি লিখে দিয়েছিলেন। এই আইনগুলি পরবর্তীকালের সভ্য জগতের অনুকরণীয় হয়েছিল।

হামুরাবির কোডের বর্ণনা অনুসারে সমাজে তিন শ্রেণীর লোকের বাস ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, সৈনিক ও রাজকর্মচারীগণ, এদের বলা হতো এমিলু (Amelu)। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন—দেশের সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পীগণ, এঁরা হলেন মুসকিন্ (Mushkin)। তৃতীয় বা শেষের শ্রেণীতে ছিলেন দাসগণ—এদেরকে ওয়ার্ডু (Wardu) বলা হত। সকল শ্রেণীর জন্য একই রকম শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না। হামুরাবির ধারণা ছিল শক্তিমান ব্যক্তিগণ সাধারণের উপর কর্তৃত্ব করবে। তিনি সৈনিকদের মধ্যে জমি বিলি করে তাদের জমির মালিক কর দেন। এভাবে একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। জনসাধারণের অবস্থা খুব উন্নত ছিল বলে মনে হয় না। হামুরাবির মৃত্যুর পর ব্যাবিলন সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিল না। শক্তিশালী অ্যাসিরিয়াবাসীগণ তাঁর রাজ্য দখল করে নেয়।

মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তার

নীলনদের মোহনায় ছোট একটি দেশ। এর নাম মিশর। এই দেশের প্রথম রাজা মেনেস। তিনি কি করে সমগ্র মিশরকে একটি রাজ্যে পরিণত করেছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মেনেস হলেন প্রথম রাজবংশের প্রথম রাজা। এমনি ত্রিশটি রাজবংশের অনেক রাজা এখানে প্রায় তিন হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন।

কৃষি ও বাণিজ্যের ফলে এ দেশের ধনসম্পদ খুব বেড়ে

গিয়েছিল। ফেরাওগণ খুব বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। দেশকে শক্তিশালী করার কথা তাঁরা ভাবতেন না। ভাবতেন কি করে পরলোকে গিয়ে সুখে বাস করবেন। রাজা হওয়ার পর থেকেই তাঁরা পরলোকের কথা চিন্তা করতেন। তাঁদের সব ধনসম্পদ পিরামিড তৈরি করতেই খরচ হয়ে যেত।

মিশরের শস্যশ্যামল অঞ্চলের দিকে বর্বর জাতিদের লোভ ছিল অনেক দিন থেকেই। মাঝে মাঝেই এরা মিশরে হানা দিত; কিন্তু সব সময় পেরে উঠতো না। এদের মধ্যে হিকসস্ জাতির লোকেরা সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রায়ই হানা দিত।

দ্বাদশ বংশের রাজা তৃতীয় আমেনহেট (Amenhet III) একদল সৈন্য পাঠিয়ে সিরিয়া দখল করে নিলেন। এর ফল হল খুব খারাপ। হিকসস্ জাতির দুর্ধর্ষ লোকেরা হানা দিয়ে সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চল থেকে মিশরবাসীদের তাড়িয়ে ছিল। এদের যুদ্ধের উপকরণ ছিল উন্নত ধরনের। ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে, উন্নত ধরনের ধাতুর অস্ত্র নিয়ে এরা যুদ্ধ করত। মিশরবাসীদের এসব কিছুই ছিল না। তাই তারা হেরে গেল। এটাই মিশরবাসীদের পক্ষে শাপে বর হল। তারাও এই সময় থেকেই নূতন রণকৌশল ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা লাভ করতে আরম্ভ করল।

সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজা ছিলেন আমোস (Ahmose)। ইনি স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করলেন ও সৈন্যদের উন্নত রণকৌশলও শেখালেন। নীল নদের উপত্যকাবাসী হিকসস্‌দের তাড়িয়ে তিনি মিশরের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর বংশধরেরাও তাঁর নীতি অনুসরণ করল। এই ভাবে মিশরের সীমানা বহু দূর অবধি বিস্তৃত হল।

উপনিবেশ ঃ রাজা প্রথম থুথমস খুব বীর ছিলেন। তিনি মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি আরও অনেক অঞ্চল দখল করে তাঁর সাম্রাজ্য আরও বাড়ালেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় থুথমসও বাবার মতই উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। সম্রাট তৃতীয় থুথমস ছিলেন অষ্টাদশ রাজ-

বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি উৎসাহী ও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীও ছিল খুব শক্তিশালী। প্রথমে তিনি সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন সম্পূর্ণ দখল করেন। সেখানকার অধিবাসীরা আর যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে সেজন্য সেখানে উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করলেন। তৃতীয় থুথমস ছিলেন সে সময়কার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত রাজা।

তৃতীয় থুথমস

রাজা পঞ্চম আমেনহেট দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি সব সময় পুরোহিতদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতেন। এর ফলে বহু রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন আবার বিদ্রোহ করে। রাজা প্রথম সেথি এই বিদ্রোহ দমন করেন। কিছুকাল পরে সম্রাট দ্বিতীয় রামসেস্ আবার প্যালেষ্টাইনের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান। খাদেশ নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। হিটাইট্গণ অসুবিধায় পড়ে কিছুদিনের জন্য সরে যায়। রাজ্যে ফিরে গিয়ে রামসেস্ বিজয়-উৎসবও পালন করেন। হিটাইট্গণ কিছু দিনের মধ্যেই শক্তি সংগ্রহ করে নতুন উৎসাহে যুদ্ধ করে প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া দখল করে রাজা রামসেস্‌কে সন্ধি করতে বাধ্য করে? খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইন্দো-ইউরোপীয় ও লিবিয়াবাসীর আক্রমণে মিশর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। মিশর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও পরবর্তী গ্রীক ও অ্যাসিরিয়ার সভ্যতায় এদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

পুরোহিতগণের ক্ষমতা ঃ মিশরের লোকেরা পরকালে বিশ্বাস

করত। ফেরাওগণ পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের দেবতার বংশধর বলে প্রচার করতেন। দেবতার সম্মানও তাঁরা আদায় করতেন প্রজাদের কাছ থেকে। এই কাজের প্রধান অস্ত্র হলেন পুরোহিতগণ। নানা গল্প কাহিনী, যাদুবিদ্যা প্রভৃতির সাহায্যে দেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করে দিতেন। সুতরাং রাজারাও তাঁদের সম্মান করতেন। তবে রাজা থেকে তাঁর আসন উচ্চে ছিল না—যেমন ছিল সুমেরে। তা ছাড়া এখানে দেবতা ও দেব-মন্দিরও কম ছিল না। এই সব দেব-মন্দিরের অনেক সম্পত্তি ছিল। এই সকল সম্পত্তির আয়ও পুরোহিতরাই পেতেন। ক্রমে তাঁরা ধনশালী হয়ে উঠেন। রোগ, ব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি দেবতার অভিশাপ বলে মনে করা হতো। এগুলির হাত থেকে বাঁচার জন্যও লোকে এদের শরণাপন্ন হত। রাজারাও যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতির জন্য এঁদের পরামর্শ নিতেন। এমনিভাবে পুরোহিতরা রাজা ও জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মবিশ্বাসী দেশে পুরোহিতরা খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।
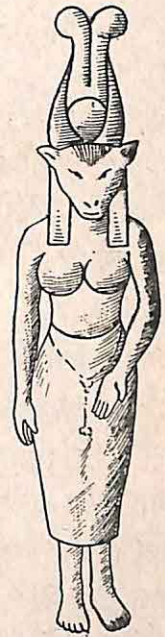
ইজিপ্টের দেবতা

ইরাণ

পারস্যের অভ্যুদয়ঃ পারস্য উপসাগরের উত্তর-পূর্বদিকের দেশটি হল পারস্য। এই দেশকে এখন ইরাণ বলা হয়। ১২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার একদল লোক এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এরা আর্য ভাষাভাষী লোক ছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৫৬০ অব্দে এখানে এক শক্তিমান নেতার আবির্ভাব হয়। এর নাম **কাইরস** বা **সাইরস** বা **ক্সুরুষ** (Cyrus)। দেশের বড় বড় চাষীদের সাহায্যে তিনি একদল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

কিছুদিনের মধ্যে পাশের রাজ্য মিডিয়া তিনি দখল করেন। মিডিয়ার লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষায় বেশ উন্নত ছিল। এদেরকে সাথে নিয়ে তিনি বেশ বড় সৈন্যদল তৈরি করে এশিয়া মাইনরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ক্রোসাসের (Croesus) সম্পদশালী রাজাকে পরাজিত করলেন। সেখানে তিনি অনেক ধনরত্ন লুট করলেন। এই ধনের সাহায্যে সৈন্যবাহিনী আরও বাড়ালেন, রাজধানীকেও সুসজ্জিত করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে একনিড রাজবংশ বলে। ৫৩৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে তিনি ব্যাবিলন দখল করে সেখানকার বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। ব্যাবিলনের রাজা প্যালেষ্টাইন দখল করে, সেখানকার লোকদের বন্দী করে রেখেছিলেন। মুক্তি পেয়ে এরা দেশে ফিরে গেল। এইভাবে তিনি সিরিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। আফগানদের সাথে এক সংঘর্ষের ফলে তিনি নিহত হন। কাইরসের পুত্র **ক্যামবিসেস** বীর হলেও খামখেয়ালী রাজা ছিলেন। তিনি মিশর দখল করেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁরই এক আত্মীয় রাজা হলেন। তাঁর নাম **দারায়ুস**। দারায়ুস সাহসী ও বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। তিনি অনেক রাজ্য জয় করে সিন্ধুনদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করে।

দারায়ুস

গ্রীকদের সহিত বিরোধঃ সম্রাট কাইরাস যখন লিডিয়া রাজ্য জয় করেন সেই সময় এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্যও তিনি জয় করেছিলেন। দারায়ুস গ্রীকদের ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য জয় করে দানিয়ুন নদীর তীরে আরও কতকগুলি গ্রীক অঞ্চল দখল করেছিলেন। গ্রীকরা বীরের জাতি। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এথেন্স আর কতকগুলি গ্রীক রাজ্য মিলেই এই বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহ দমন করে এথেন্সকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য দারায়ুস বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন। এথেন্সের

বাইশ মাইল উত্তরে ম্যারাথনের প্রান্তরে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হল। পারস্যের সৈন্যের তুলনায় গ্রীকদের সৈন্যসংখ্যা নগণ্য ছিল। কিন্তু এথেন্সের সেনাপতি মিটালডাসের রণকৌশল ছিল অপূর্ব। মাত্র দশ হাজার সৈন্যের সাহায্যে তিনি বিরাট পারসিক বাহিনীকে হারিয়ে দিলেন। বিপদের সময় এথেন্স গ্রীস দেশের স্পার্টা নামে এক রাজ্যের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল, কিন্তু সাহায্য পাওয়া যায় নি। যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে পেডিপিডাস নামক একজন এথেন্সবাসীকে পাঠান হল। তিনি খুব দ্রুত গতিতে ২৬ মাইল দৌড় দিলেন এথেন্সের দিকে। এথেন্সবাসী যুদ্ধের খবরের জন্য অপেক্ষা করছিল। পেডিপিডাস বিজয় সংবাদ দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে বললেন—আনন্দ কর, আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। এই কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায়। এই দৌড়ের প্রতিযোগিতাকে বলা হয় **ম্যারাথন রেস**।
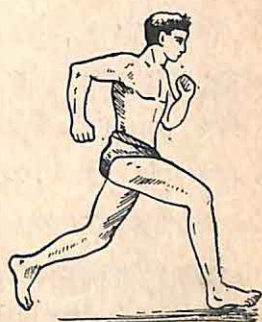
ম্যারাথন দৌড়

কিছুদিন পরেই দারায়ুস মারা গেলে পারস্যের রাজা হলের তাঁর ছেলে **জেরেক্সস্**। তিনিও পিতার মতই যোদ্ধা ছিলেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। গ্রীকরাও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হল। নিজেদের বিবাদ-বিরোধ ভুলে সব রাজ্য একজোট হল পারসিকদের বাধা দিবার জন্য। স্পার্টার রাজা **লিওনিডাস** এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিলেন। এদিকে পারস্য সৈন্য এসে পৌঁছাল থার্মোপলির গিরিপথের কাছে—খুব সরু জায়গায়। এখানেই লিওনিডাস অপেক্ষা করছিলেন তার সৈন্য নিয়ে। পারসিকরা টিকতে পারল না তার সামনে। জেরেক্সসের সাথে নৌবাহিনীও ছিল। তিনি অন্য পথ দিয়ে গ্রীকদেশে ঢোকার চেষ্টা করেও বিফল হলেন। এমন সময় একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক সৈন্যের কাছে তিনি গ্রীসে ঢোকার গোপন পথ জেনে নিলেন আর পেছন দিয়ে থার্মোপলিতে সৈন্য পাঠালেন। গ্রীকদের কোন

উপায় রইল না। লিওনিডাস মাত্র তিনশ সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। এই যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কথা অমর হয়ে আছে। পারসিকরা যখন এথেন্স এল তখন সেখানে কোন লোক ছিল না। সবাই দেশ ছেড়ে চলে গেছে। এথেন্সে পারসিকরা আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে ফেললো। এরপর নৌযুদ্ধ হল সালামিসে, এখানে গ্রীকরা আশ্রয় নিয়েছিল। বীর থেমেস্টোক্লিসের রণ-কৌশলে পারসিকরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। এর পরও জেরেক্সাস কয়েকবার অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্লেটিয়া ও মিকেলের যুদ্ধে পারসিকরা সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়। গ্রীকদের রণকৌশল ও উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে লম্বা বর্শার সঙ্গে পারসিকদের প্রাচীন তীর-ধনুকের কোন তুলনাই হয় না। এর প্রায় দেড়শ বছর পরে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে পারস্য সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়ে।

পারস্য সাম্রাজ্য প্রায় দুই শত বৎসর টিকে ছিল। এই সময় এখানে শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। পারস্যের রাজারা জাঁকজমক ভালবাসতেন। সম্রাট দারায়ুস মূল্যবান পোশাক পরে, পারিষদ পরিবৃত হয়ে থাকতেন। তাঁর মাথায় মূল্যবান টুপি, মুখে চারকোণা করে ছাটা দাড়ি, গায়ে বেগুনী রঙের জামা ও পায়ে পশমের পাজামা থাকতো। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় তিনি নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

জরাথুষ্ট্র

ধর্ম ঃ জরোয়াস্টার — জরাথুষ্ট্র (Zoroaster) ঃ জরাথুষ্ট্র প্রচারিত ধর্মই পারস্যে প্রচলিত ছিল। কোথায় এবং কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না। তাঁর প্রচারিত ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর এক। তাঁর নাম আহুরমজদা (Ormuzd) ইনি আলো, সত্য, সরলতা, পবিত্রতা ও সূর্যের দেবতা অর্থাৎ যা কিছু ভাল তারই দেবতা হলেন এই

আহুরমজদা। আর এক দেবতা আছেন তিনি এর বিপরীত। ইনি হলেন ষড়যন্ত্র, কূটবুদ্ধি, প্রতারণা, অন্ধকার প্রভৃতি—অর্থাৎ যা কিছু খারাপ তারই দেবতা। এর নাম **অহিমান** (Ahriman)। জগতে ভাল, মন্দ, আলো, অন্ধকার এই বিপরীত ভাবকে কেন্দ্র করেই পারসিক ধর্মের সৃষ্টি। আহুরমজদাকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি মানুষকে রক্ষা করেন অহিমানের হাত থেকে—অর্থাৎ যা কিছু খারাপ তার থেকে। পৃথিবী ও আগুনকে তারা পবিত্র মনে করে ও পূজা করে। এরা মূর্তিপূজা করে না; কিন্তু এদের মন্দির আছে। সেই মন্দিরের বেদীর উপর পবিত্র অগ্নি জ্বালিয়ে রাখা হয়। এই আগুনের পূজাও করা হয়। এদের পুরোহিত আছে—এদের বলা হয় **দস্তুর**। পারসিকরা পৈতা পরেন—এর নাম **'কস্তি'**।

ইহুদি জাতি

মিশরে ইহুদিগণ : সেমাইট জাতির বংশধর ইহুদিগণের বহুদিন ধরে নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের গোড়ার দিককে বলা হয় **ওল্ড টেষ্টামেণ্ট**। ইহুদি জাতির প্রাচীন ইতিহাস এই ওল্ড টেষ্টামেণ্টে লিখিত আছে। এই জাতির লোকেরা বহুদিন ধরে মেসোপটেমিয়ার বাস করেছিল। এখানকার জীবনযাত্রা এদের বেশী দিন ভাল লাগলো না। এখানে বাস করত একজন চাষী, তার ভগবানে খুব বিশ্বাস ছিল। এর নাম **আব্রাহাম**। আব্রাহামের নেতৃত্বে এরা মেসোপটেমিয়ার সুমের থেকে পশ্চিম দিকে কোন ভাল বাসস্থানের সন্ধানে যাত্রা করে। পথে এদের অনেক দুঃখকষ্ট পেতে হয়। অবশেষে 'কানন' নামে এক সুন্দর জায়গায় এরা বসবাস করতে আরম্ভ করে। এই কাননকেই **প্যালেষ্টাইন** বলা হয়। এই সময়ে সেমাইট জাতির আর একটি শাখার লোক এখানে আসে এবং ওদের সাথেই বাস করতে আরম্ভ করে। আব্রাহামের বংশধরেরা সেমাইট ভাষার উন্নতি বিধান করে। এই ভাষাকে বলা হয় **হিব্রু ভাষা**। এই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন তাঁরা হলেন **হিব্রু জাতি**। প্যালেষ্টাইনে কৃষিকাজের খুব সুবিধা ছিল না, কারণ

এখানে বৃষ্টি হত খুব কম। এখানে এসে প্রথম দিকে এরা মেষ পালন করত। তারপর ক্রমশঃ কৃষিকাজ শেখে।

কিছুদিন পরে প্যালেষ্টাইনের হিব্রুগণ মিশরের শস্যশ্যামল ভূমির দিকে অগ্রসর হন ও নীলনদের উপত্যকায় বাস করতে আরম্ভ করেন। মিশরের ফেরাওগণ তাদের বসবাসে আপত্তি করতেন না। তাদের দিয়ে নানা ধরনের কাজও করিয়ে নিতেন। ১৭৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিকসস্ জাতির লোকেরা মিশর আক্রমণ করে ও অনেক স্থান অধিকার করে। এরাও সেমিটিক জাতির লোক। এই নতুন লোকের সাথে হিব্রুদের কিছুদিন বেশ ভাল ভাবেই কাটল। এদের মধ্যে একজন ধনীলোক ছিলেন। তিনি জেকবের পুত্র **জোসেফ**।

ফেরাও **প্রথম আমোস** (Ahmose I) হিক্‌সসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সমগ্র মিশর থেকে হিক্‌সসদের তাড়িয়ে দিলেন। অনেককে বন্দী করলেন। হিব্রুগণও বন্দী হলেন। মিশরের ফেরাওগণের ক্রীতদাস হয়ে তারা জীবন কাটাতে বাধ্য হল। এই অবস্থায় তাদের প্রায় একশ বছর কাটাতে হয়েছিল। তাদের জীবনযাত্রার ইতিহাস দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার ইতিহাস। ইতিমধ্যে মিশরেই এক ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হল ১২৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। এর নাম মোজেস, ইনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। মিশরের ফেরাওদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে তিনি হিব্রুদের সংঘবদ্ধ করে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুললেন। অবশেষে ফেরাও দ্বিতীয় রামসেস তাদের মুক্ত করে দিতে বাধ্য হলেন। মিশর থেকে কানন বা প্যালেষ্টাইন বহু দূর পথ। মোজেসের নেতৃত্বে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছালেন। পথেই অনেকে প্রাণ হারালেন—তার বদলে ফিরে পেলেন মুক্তি ; দাসত্ব থেকে তাঁরা মুক্ত হলেন। এর জন্য হিব্রুরা মোজেসকে তাদের ত্রাণকর্তা বা ঈশ্বরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে শ্রদ্ধা করেন। এই মুক্তি-অভিযান বা এক্সোডাস হিব্রু ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর ফলেই হিব্রুদের জাতীয় ঐক্য ফিরে এসেছিল। হিব্রু জাতিকে সংগঠিত করার জন্য মোজেস কতকগুলি নীতি ও আইন প্রণয়ন করলেন।

বাইবেলে এই আইনগুলি লিখিত আছে। একে Ten Commandments বা দশটি আদেশ বলে। হিব্রুগণ মনে করেন ভগবান বা জিহোবা মোজসকে এই আদেশগুলি দান করেছিলেন সিনাইএর মরুভূমিতে। আদেশগুলিতে ধর্মীয় উপদেশ আছে। ঈশ্বর অর্থাৎ জিহোবা এক ও অদ্বিতীয়। সকল মানুষের সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করা উচিত ইত্যাদি।

প্যালেষ্টাইনে পৌঁছে কিন্তু হিব্রুদের সুখে শান্তিতে কাটেনি। কিছুদিনের মধ্যেই এদের মধ্যে নানা ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। তাছাড়া প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীরাও এদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এদের সাথেও যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। অবশেষে সাম্‌নন বলে এক শক্তিমান নেতা হিব্রুদের একত্রিত করেন এবং ফিলিষ্টাইনদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ১০৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সাম্‌সনের পুত্র সল রাজা হন। ইনিও হিব্রু জাতিকে সুসংবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন।

১০১০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ডেভিড এখানকার রাজা নির্বাচিত হন। এঁকে ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ বলা হয়। ইনি সিরিয়া প্রভৃতি জয় করে খুব বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এঁর রাজধানী ছিল **জেরুজালেম**। এঁর মৃত্যুর পর এঁর পুত্র **সোলেমন** রাজা হন। বাইবেলে একটি গল্পে আছে তিনি কেমন করে পাথর ছুঁড়ে ফিলিষ্টাইনের দৈত্য গোলিয়াথকে হত্যা করেন। এর অর্থ তিনি ফিলিষ্টাইনের লোকদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

অনুশীলনী

১। মানুষ কখন লোহার ব্যবহার শিখেছিল? লোহা ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনে কি পরিবর্তন এসেছিল?

২। লৌহ যুগ কাকে বলে? এই যুগে রাজশক্তির বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

৩। ব্যাবিলন কোথায় অবস্থিত? এখানের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা আলোচনা কর।

৪। ব্যাবিলনে কোন্ কোন্ দেবতার পূজা হত? ব্যাবিলনের মন্দির ও পুরোহিত সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৫। হামুরাবি কে ছিলেন ? তাঁর আইন সংকলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। মিশর কোথায় অবস্থিত ? মিশরের সাম্রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ দাও।

৭। মিশরের পুরোহিতগণের ক্ষমতা কি ছিল ? মিশরের দেব-দেবী সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। ইরাণের পূর্ব নাম কি ? এই দেশের অভ্যুদয়ের বিবরণ দাও।

৯। জরোয়াষ্টারের ধর্মমত কি ? কোথায় এটি প্রচলিত ছিল ? সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১০। ইহুদি জাতির বাসস্থান কোথায় ছিল ? এই জাতির প্রাচীন ইতিহাস জানার উপায় কি ? ইহুদি জাতির জীবনধারা সম্পর্কে যা জান লিখ।

১১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) হিটাইট্ জাতির লোকেরা কখন লোহার ব্যবহার শিখেছিল ?

(খ) মারডুক কি ? কোন্ সভ্যতায় এর উদ্ভব হয়েছিল ?

(গ) পৃথিবীর সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

(ঘ) ম্যারাথন দৌড় কাকে বলে ?

(ঙ) ইহুদি কারা ? তাদের বাসস্থান কোথায় ছিল ?

১২। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) মিশরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল—নীল নদকে কেন্দ্র করে/ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করে।

(খ) ইরাণের শক্তিমান নেতার নাম—ক্রুস/হামুরাবি।

(গ) ম্যারাথন দৌড় যিনি করেছিলেন তাঁর নাম—থিবস/পেডিপিডাস।

(ঘ) জরাথুষ্ট্র ধর্ম প্রচলিত ছিল—সাইবেরিয়ায়/পারস্যে।

(ঙ) ইহুদি রাজা ডেভিডের রাজধানী ছিল—জেরুজালেমে/ইরাকে।

১৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ব্যাবিলোনিয়ার দু'টি ভাগ ; একটি হল সুমের এবং অপরটি— ।

(খ) ব্যাবিলনের প্রধান দেবতার নাম— ।

(গ) হামুরাবির আইন যে লিপিতে লেখা হত তার নাম— ।

(ঘ) জেরেক্সাস ছিলেন— রাজা।

(ঙ) পারসিকগণ যে পৈতা ধারণ করেন তার নাম—

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক. গ্রীস ও ক্রীট সভ্যতা
খ. এথেন্স ও স্পার্টা
গ. এথেন্সের মহান সংস্কৃতি
ঘ. ম্যাসিডন ও আলেকজাণ্ডার

এথেন্স ও স্পার্টার বীরত্ব কাহিনী তোমরা শুনেছ। দুটিই হল
গ্রীক রাজ্য। পারস্যের রাজা দারায়ুস আর রাজপুত্র জেরেক্সে'র
সৈন্যবাহিনীকে এরা হারিয়ে দিয়েছিল। এক সাথে মিলে যুদ্ধ
করেছিল বলেই তারা সফল হয়েছিল। এখানে এমনই আরও অনেক
রাজ্য ছিল। সবগুলি মিলেই গ্রীস দেশ। ইউরোপের মধ্যে এরাই
সবচেয়ে আগে সভ্য হয়ে উঠেছিল। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার
উপর গ্রীক সভ্যতার ছাপ এখনো আছে।

গ্রীসে ক্রীটের সভ্যতার প্রভাব ঃ গ্রীসের দক্ষিণে ক্রীট নামে
একটা দ্বীপ আছে। প্রাচীনকালে মোনিয়ান নামে এখানে এক
রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল **ক্নস্সে**। প্রাচীনকালে সুমের,
ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি অঞ্চলে যখন মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছিল,
তখন এখানকার লোকেরাও সুসভ্য ছিল। রাজা মোনিয়ানের নাম
অনুসারে এই সভ্যতাকে বলা হয় **মোনিয়ান সভ্যতা**। খননকার্যের
ফলে এখানে প্রাচীন সভ্যতার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই
নিদর্শনগুলি দেখে মনে হয় প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা এদের কাছ থেকে
অনেক কিছু শিখেছিল। বিশেষ করে গ্রীসের শিল্পকলা, নাচগান,
খেলাধূলা ও ধর্মে এই প্রভাব দেখা যায়।

খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি গ্রীসে মাইসীনীয় জাতির
লোকেরা আসে। এরা ছিল পিলোপনেসিয়ার অধিবাসী। এরা
মোনিয়ান সভ্যতা ধ্বংস করে দেয়। মাইসীনীয় সভ্যতা ধ্বংস হয়
খৃষ্ট পূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা এসে এদের তাড়িয়ে এখানে বাস
করতে আরম্ভ করে। এরা ছিল বর্বর জাতির লোক। মাইসীনীয়দের
যুদ্ধে হারিয়ে, বন্দী করে এরা ক্রীতদাসে পরিণত করে। খৃষ্ট পূর্ব

১২০০ অব্দে এরা ট্রয়দেশের উপর অভিযান চালায়। এই অভিযানের কথা আছে গ্রীক কবি হোমারের লেখায়। হোমার এদের নাম দিয়েছেন একিয়ান। আসলে এরা ডোরিয়ান জাতির লোক।

হোমারের যুগ : হোমার গ্রীসের সবচেয়ে প্রাচীন কবি। সম্ভবতঃ তিনি খৃষ্ট পূর্ব ৯০০-৮৫০ অব্দের লোক ছিলেন। তিনি দুটি মহাকাব্য রচনা করেন — **ইলিয়াড ও ওডেসী**। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস স্পার্টা বেড়াতে এসে এখানকার রাজা আগামেননের ভাই মিনালাউসের সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে সাথে করে নিজের দেশ ট্রয়ে নিয়ে যান। গ্রীকরা তার রাজ্য দখল করে দশ বছর পর হেলেনকে দেশে ফিরিয়ে আনেন। এই হল ইলিয়াডের কাহিনী। ওডেসীর কাহিনীতে আছে এথিকার রাজা অডিসিউস আর এক গ্রীক বীর কি করে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক হলেও মূলত পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু পরবর্তী গ্রীক ও অন্যান্য সাহিত্যে এর প্রভাব পড়েছে। সম্ভবতঃ ইলিয়াড ও ওডেসী একজন লোকের লেখা নয়—একটি সংকলন গ্রন্থ। সে সময়কার গ্রীকদের জীবনযাত্রা প্রণালী, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথা এই লেখাতে পাওয়া যায়। হোমারের যুগকে বীরের যুগ বলা হয়।

হোমার

নগর-রাষ্ট্র : ডোরিয়ানগণ গ্রীসে এসে চাষবাসের খুব উন্নতি করল। এরা লোহার তৈরী লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করত। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি এরা উন্নত হয়ে উঠল। একিয়ান যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে বেশ কিছু লোক এদের সাথে মিশে গেল—আর কিছু ক্রীতদাসে পরিণত হল। ডোরিয়ানগণ ক্রমে ধনবান হয়ে উঠল। নিজেরা জমি চাষ না করে ক্রীতদাসদের দিয়ে এই সব কাজ করাতে

লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির দিকেও এরা নজর দিল। এদের উন্নতির সাথে সাথে স্পার্টা, করিন্থ, আরগস, মেগেরা, এথেন্স প্রভৃতি স্থানে নতুন নতুন শহর তৈরি হল। শহরের চারপাশের জায়গাগুলি দখল করে এরা এক একটি অঞ্চলে পরিণত করল। ডোরিয়ানগণ যখন গ্রীসে এসেছিল, তখন এদের দলপতিরাই ছিল প্রধান। তারাই এক একটা অঞ্চলের রাজা হল। এইভাবে নগর-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। অঞ্চলের রাজারাই সর্বেসর্বা। তারাই দেশ শাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার, পুরোহিতের কাজ করত। এইভাবে দেশ শাসনে অনেক অসুবিধা হতে লাগল। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে এখানে ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। দেশ শাসনের ভার এখন এদের হাতেই এসে গেল। এর নাম অভিজাততন্ত্র বা ধনী লোকদের শাসন-ব্যবস্থা। অভিজাত শ্রেণীর পরের শ্রেণী হল কারিগর, ব্যবসায়ী ও শিল্পী। এরা কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। সবচেয়ে নীচের শ্রেণী হল মজুর ও দাস। এরা সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল।

যোগাযোগ ঃ অনেকগুলি রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগ আরম্ভ হতে লাগল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, লেখার পদ্ধতি এক রাজ্য অন্য রাজ্যের লোকের কাছে শিখতে লাগালো। লেন-দেনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যও চলত। কোন কোন সময় এদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ যে হতো না তা নয়। বাইরের দেশগুলির সাথেও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হল। বিশেষ করে পারস্য, ফিনিশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ হল।

উপনিবেশ ঃ দেশের উন্নতির সাথে সাথে এখানকার লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল। কিছু কিছু লোক এখানকার জীবনযাত্রা পছন্দ করত না। ভাল বাসস্থানের খোঁজে অনেকে বেরিয়ে পড়ল। এইভাবে গ্রীসের লোকেরা বাইজেন্টিয়াম, সিসিলি ও ইতালীর কোন কোন অঞ্চলে উপনিবেশ তৈরি করল। নিজের দেশের মত এখানেও তারা ঘরবাড়ী তৈরি করল, মন্দির তৈরি করল, গ্রীসের দেবদেবীকে পূজা করতে লাগল। ক্রমে এরা কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করতে আরম্ভ করল। এই সময় আর এক জাতির মানুষ এদের সাথে

এসে যোগ দিল। এদের **আইয়োনিয়ান** বলা হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর নগর-রাষ্ট্রগুলিতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে লাগল। শাসন-ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন দেখা দিল। স্পার্টা ও এথেন্স নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করল।

এথেন্স ঃ এথেন্স রাজ্যে পার্বত্য এলাকায় একটা টিলার চারপাশে শহর গড়ে উঠেছিল। এই শহরকে এথেন্সবাসীরা বলত 'অ্যাক্রো-পলিশ'। টিলার উপরে ছিল দেবী এথেনীর মন্দির। এই দেবীর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম হয়েছিল এথেন্স। শহরের চারপাশে উর্বর মাঠ ছিল। চাষীরা এখানে চাষ করে প্রচুর শস্য ফলাত। এই অঞ্চলে জলপাইএর গাছও ছিল অনেক। জলপাইএর তেল বিদেশে রপ্তানী হত।

সামাজিক জীবন ঃ এখানকার অধিবাসীরা পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করত। এদের ছোট ছোট এক ধরনের বাড়ী ছিল। সেগুলি দেখতে খুব সুন্দর। বাড়ীর ভেতরের আসবাবপত্রও সুন্দর ছিল। ধনী লোকেরা শহর থেকে দূরে বড় বড় বাড়ীতে বাস করতেন। এথেন্স ছিল সুন্দরের পূজারী। দেশের লোকেরা ইচ্ছামত গল্প, আমোদ-আহ্লাদ, খেলাধূলা করে কাটাত। কোন সাধারণ স্থানে রাজ্যের শাসনের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা করত। শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল খুব উদার। দেশের ছেলেদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ছিল। এখানকার শিক্ষকগণ খুব জ্ঞানী ছিলেন। এছাড়া এথেন্সে অনেক চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক লোকে এদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে আসতো। খেলাধূলা, নাচগান, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিষয়েও এদের উৎসাহ কম ছিল না। মোটামুটি এরা সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাত।

রাজনৈতিক জীবন ঃ কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এখানে এক বিশেষ ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। এক একজন ব্যক্তি প্রচুর জমির মালিক হয়ে খুব ধনী হয়ে ওঠেন। মাঠে যারা চাষ করত তাদের অবস্থা ভাল ছিল না। অনেক চাষীকে ঋণ করতে হত। ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকে

ক্রীতদাস হতে বাধ্য হত। ডেক্রন বলে এখানে একজন ব্যক্তি অনেক আইন তৈরি করেছিলেন। সে সব আইন ধনী লোকেরা মানতো না। তাদের ইচ্ছামত তারা আইন বদলে ফেলত। এতে দেশে খুব অসন্তোষ দেখা দিল। ৫৯০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সোলন নামে একজন বিখ্যাত লোক জন্মগ্রহণ করেন। গরীবদের উপর তাঁর দরদ ছিল। অনেক বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশের নতুন আইন তৈরি করলেন। আইনগুলি স্তম্ভের উপর লিখে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়ে দিলেন—যাতে সকলে সেগুলি জানতে পারে। দেশে শাসন-ব্যবস্থার ভার দেওয়া হল একটি পরিষদ বা সভার উপর। এর সদস্য সংখ্যা চারশত। কেবল দাস ছাড়া আর সব শ্রেণীর লোকেরাই এই সভার সভ্য হতে পারত। বিচারের জন্য তিনি জুরী ব্যবস্থা (অনেক লোকে এক সাথে বসে বিচার) প্রবর্তন করলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই আবার গোলমাল সৃষ্টি হল। এই সময় 'পিসিস্ট্রাস' নামে একজন নেতা নির্বাচিত হলেন। তিনিই হলেন দেশের সর্বময় কর্তা। তাঁর সময় নানা উন্নতিমূলক কাজ হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আবার গোলমালের সৃষ্টি হয়। এবার নেতা নির্বাচিত হলেন 'ক্লেয়িসথেনেস' নামে এক ব্যক্তি। তিনি সোলনের সময়কার আইনগুলি আবার চালু করলেন ও কিছু কিছু বদলে নতুন আইন করলেন। এর সময়ে ঠিক গণতন্ত্র চালু হয়েছিল। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি সে গণতন্ত্র চালু হয়নি। ৫০০ জন সদস্য নিয়ে এক পরিষদের হাতে দেশের আইনকানুন তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হল। দেশের জনসাধারণ ভোট দিয়েই এদের নির্বাচিত করত। বিচার-ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি করা হল।

স্পার্টা ঃ পিলোপনেসাসের দক্ষিণ দিকে ডোরিয়ানগণ যে ছোট নগর-রাষ্ট্র গঠন করেন তার নামই স্পার্টা। স্পার্টার উন্নতি হয়েছিল অন্যদিকে। সামরিক শক্তিই ছিল এদের কাছে প্রধান।

সামাজিক ব্যবস্থা ঃ এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় নানা কঠোর আইন ছিল। এরা চেয়েছিল দেশের প্রতিটি লোক যেন সৈনিক

হয়ে ওঠে। তাদের দেহ যেন সুগঠিত হয়। সাত বছর বয়স হলেই এখানকার ছেলেমেয়েদের সামরিক বিদ্যালয়ে পাঠাতে হত। এখানে অনেকদিন ধরে শিক্ষা লাভ করে যখন তারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত হত তখনই তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো। স্পার্টার নাগরিকগণই শুধু এই সুবিধা পেতো। চাষ করান হতো দাস ও মজুরদের দিয়ে। এরা নাগরিক অধিকার পেত না। স্পার্টার নাগরিকদের অন্য শ্রেণীর লোকদের সাথে বিয়ে করতে দেওয়া হত না। খেলাধূলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্র চালনা ছিল এদের প্রিয় বিষয়। এইভাবে এখানকার লোকেরা এক শক্তিশালী সামরিক জাতিতে পরিণত হয়। এর ফলেই এরা পারস্য-রাজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে পেরেছিল। স্পার্টার নাগরিকদের পরই স্থান ছিল দেশের কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের। এরাও নাগরিক অধিকার—অর্থাৎ দেশ শাসন-ব্যবস্থার অধিকারী হতো না। তবে এদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। এর পরের শ্রেণীর লোকেরা হলো মজুর ও দাস। এদের হেলট বলা হত। এদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। এইভাবে চলার ফলে স্পার্টা বীরের জাতিতে পরিণত হয়। এদের সৈন্যবাহিনী গ্রীসের শ্রেষ্ঠ সৈন্য-বাহিনীতে পরিণত হয়। কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এরা অনেক পিছিয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক জীবন : নগর-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময় এখানে দু'জন রাজা থাকতেন। দেশের শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার এঁদের উপরই ছিল। উৎসব, অনুষ্ঠান পরিচালনা অর্থাৎ প্রধান পুরোহিতের কাজও এরাই করত। এরপর দেশের শাসন-ব্যবস্থা নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতে যায়। এদের 'এফর' বলা হত। রাজ্যের নাগরিকগণই এদের নির্বাচন করত। দাস বা হেলটদের নির্বাচনে কোন অংশ ছিল না। খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে দাসগণ বিদ্রোহ করে, কিন্তু স্পার্টানগণ কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। আর যাতে বিদ্রোহ না হতে পারে তার জন্যই সামরিক কায়দায় দেশকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। দেশের আইন তৈরি ও বিচারের ভার ছিল একটা পরিষদের উপর। এটি ২৮ জন

সম্ভ্রান্ত লোক দিয়ে গঠিত হত। দেশের নাগরিকদের নিয়ে গঠিত পরিষদ এদের তৈরি আইনকানুন শুধু গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত।

এথেন্স বনাম স্পার্টা

গ্রীসের ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্রগুলি কখনও এক সাথে মিলে থাকতে পারেনি। একবারই শুধু এই মিলন ঘটেছিল। আর এই মিলনের ফলেই তারা পারস্যের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে হারাতে পেরেছিল। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্সের বিরোধ ছিল সবচেয়ে বেশী। স্পার্টানগণ সামরিক দিক দিয়ে খুব উন্নতি করেছিল। শিক্ষা ও সভ্যতায় এথেন্সের উন্নতি হয়েছিল। এথেন্সের নৌ-বাহিনীও খুব শক্তিশালী ছিল। এথেন্সের গৌরব স্পার্টা সহ্য করতে পারত না। এথেন্সের উপর তাদের ঈর্ষার ভাব ছিল। এর ফলেই রেষারেষি শুরু হয়ে যায়। পিলোপনেসাসের রাজ্যগুলির সাথে মিলে স্পার্টা একটা দল তৈরি করে। আইয়োনিয়ান রাজ্যগুলি নিয়ে এথেন্সও একটা দল তৈরি করে। প্রথম দিকে এই দলের কেন্দ্র ছিল ডেলিয়ান নগর। সেজন্য একে ডেলিয়ান লীগ বলা হয়।

তখনও গ্রীস রাজ্যগুলির উপর পারস্যের আক্রমণের ভয় কাটেনি, তার জন্যই এই দল গঠিত হয়েছিল। সব রাজ্যই এর সভ্য হতে

পারত। সাহায্য হিসাবে দেওয়া হত অর্থ ও নৌবাহিনী। স্পার্টা

কিন্তু এর সদস্য হল না। এথেন্স ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে সাম্রাজ্য বাড়াতে আরম্ভ করল। সিমন নামে এথেন্সের এক নেতা ঈজিয়ান সাগর অঞ্চল থেকে পারস্যের অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন গ্রীসের সব রাজ্যগুলিই এই দলে যোগ দিক। সেজন্য তিনি স্পার্টার কাছেও লোক পাঠিয়ে ছিলেন; কিন্তু স্পার্টা এই দলে যোগ দিতে সম্মত হয়নি। এর জন্য সিমনও ক্ষমতা হারালেন। এই সময়ে এথেন্সে এক শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হল। এর নাম পেরিক্লিস। পেরিক্লিসের ক্ষমতায় আসার কিছু আগেই এথেন্স স্পার্টার মিত্র রাজ্য থিবস আক্রমণ করে। এর ফলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধকে পিলোপনেসিয়ার যুদ্ধ বলে। অনেক দিন যুদ্ধ চলার পর শান্তি স্থাপিত হয়। ঠিক হয় যে এথেন্স ও স্পার্টা ত্রিশ বছরের জন্য শান্তিতে থাকবে—ঝগড়া-বিবাদ করবে না। থিবসের সাথে বিরোধের ফলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। একে বলে দ্বিতীয় পিলোপনেসিয়ার যুদ্ধ। এই সময় এথেন্সে প্লেগ রোগ দেখা দেয়। বহু লোক মারা যায় এই রোগে। পেরিক্লিসেরও মৃত্যু হয়। এথেন্সের সৈন্যবাহিনী স্পার্টার কাছে ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়। আবার সন্ধি হয় পঞ্চাশ বছরের জন্য। কিন্তু এদের মধ্যে বিবাদ চলতেই থাকে। এথেন্সের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। এথেন্সের সামরিক শক্তি চিরকালের জন্য ধ্বংস হলেও, শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে এদের দান অতুলনীয়।

এথেন্সের মহান সংস্কৃতি: এথেন্স ছিল সুন্দরের পূজারী। এরা যেমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তেমনি। এখানে শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়েছিল। এথেন্সের রাজধানীতে তৈরি হয়েছিল সুন্দর রাজপ্রাসাদ ও মন্দির। নানা শিল্পকাজ পাথরের তৈরি মূর্তি প্রভৃতি বসিয়ে এরা নগরীকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল। এক্রোপলিসের রাজপ্রাসাদের চিত্রগুলিতে এদের জীবনযাত্রার ছবি খুব ভাল ভাবেই ফুটে উঠেছে। এখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকদের আবির্ভাবও হয়েছিল এই সময়ে। তাদের নাম আজও সারা

পৃথিবী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। তাদের প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক শাসন-

পার্থেননের মন্দির (এথেন্স)
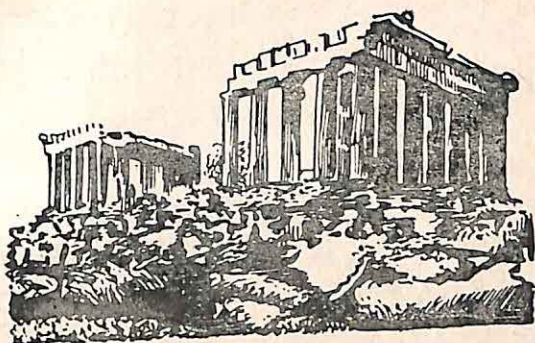
ব্যবস্থা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে পৃথিবীর লোকে মেনে নিয়েছে। এক কথায় এই সময়কে এথেন্সের **স্বর্ণযুগ** বলা যায়।

সাহিত্য : এই সময়ে এথেন্সে সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। এথেন্সে নাটক লেখারও খুব উন্নতি হয়। এগুলি নানা জায়গায় অভিনীত হত। জনসাধারণ এগুলি খুব মন দিয়ে দেখতো-শুনতো। নাট্যকারদের পুরস্কার দেওয়ারও প্রথা ছিল। গ্রীসে দর্শন, ভূতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও নানা বই লেখা হয়। গল্প, কবিতা প্রভৃতি এথেন্সবাসীর খুব প্রিয় ছিল। এগুলিও কম লেখা হতো না।

শিল্পকলা : এই সময় এথেন্সে শিল্পকলারও খুব বিকাশ ঘটে। এক্রোপোলিসের দেয়ালের গায়ে আঁকা ডিস্‌কাস হাতে একজন মানুষের সুন্দর ছবি, আজও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। শিল্পীদের মধ্যে মাইরনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম : গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ বাধলেও ধর্ম বিষয়ে কোন বিরোধ ছিল না। গ্রীসবাসীদের দেব-দেবীদের সংখ্যা কম নয়।

গ্রীসের সব লোকই এই দেব-দেবীদের পূজা করতেন। দেবতাদের বাস ছিল **ওলিম্পাস** পাহাড়ের উপরে। সকলের উপরে থাকতেন দেবরাজ **জীউস** ও তাঁর রাণী হেরা। আর্যদের দেবতা ইন্দ্রের মতই এর হাতে বজ্র থাকত। **পসাইডন** নামে সমুদ্রের দেবতাও

ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী ছিলেন **এথেনী**। অ্যাপোলো হলেন সূর্যের দেবতা। **আর্থেমিস** ছিলেন চাঁদের দেবী। গ্রীকরা দেবদেবীর পূজায় সম্মিলিত ভাবে অংশ গ্রহণ করত।

গ্রীসের দেবতা অ্যাপোলো
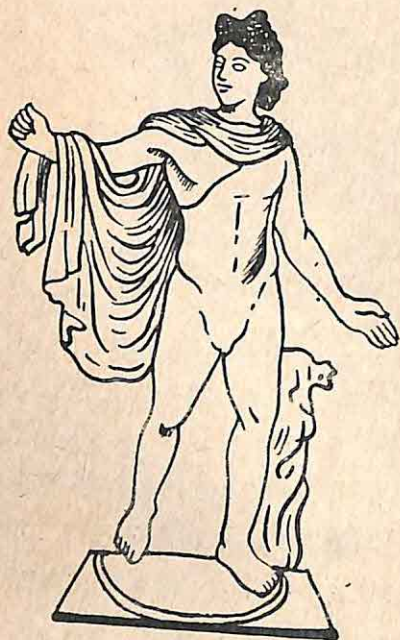
পেরিক্লিস : এথেন্সের গৌরব বৃদ্ধির মূলে হলেন **পেরিক্লিস**। এথেন্সকে তিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে গড়ে তুলেছিলেন। এথেন্সের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তিনি সরল, চরিত্রবান ও সুবক্তা ছিলেন। দেশের জনসাধারণের জন্য তার দরদও কম ছিল না। তিনি যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করেন, তাতে দেশবাসী সকলের উপকার হয়েছিল। তিনি শাসন পরিষদের সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০০ জন করেছিলেন। জুরীর বিচার প্রথারও উন্নতি বিধান করেছিলেন। তাঁর ব্যবস্থার ফলে দেশের প্রতিটি লোকই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করতে পারতো। দেশে শাসক সম্প্রদায় বলে কোন বিশেষ শ্রেণী ছিল না।

সোফোক্লিস : এথেন্সে নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সোফোক্লিস ছিলেন একজন বিখ্যাত নাট্যকার। প্রায়
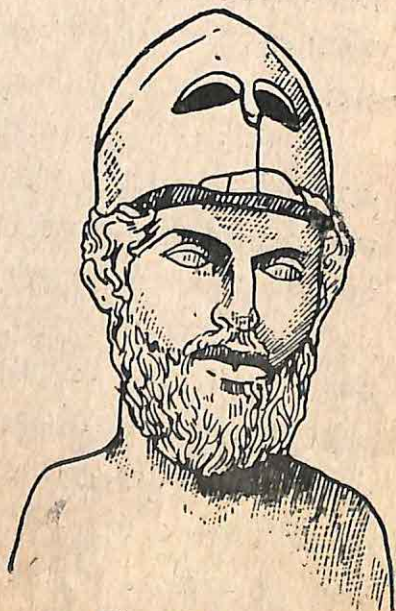
পেরিক্লিস

একশ' খানি নাটক লিখে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। দেশের নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তিনি এই সব নাটক রচনা করেছিলেন।

সক্রেটিস ঃ সেকালের পৃথিবীর অন্যতম জ্ঞানী ব'লে পরিচিত ছিলেন সক্রেটিস। তিনি বলতেন জ্ঞান লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। শুধু প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান না বুঝে মেনে নিলেই ধর্ম হয় না। তাঁর কাছে এথেন্সের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি জড় হত। পেরিক্লিসও আসতেন। বিচার ও তর্কের মাধ্যমে তিনি সত্য কথা সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। সত্যবাদিতার জন্য দেশের শাসকগণ তাঁর উপর বিরূপ হন ও বিচারের ব্যবস্থা করেন। তিনিও হাসিমুখে বিষ পান করে মারা যান। তাঁর শিষ্য প্লেটো তাঁর উপদেশগুলি লিখে রাখেন। প্লেটোর শিষ্য ছিলেন অ্যারিষ্টটল।

সক্রেটিস

হেরোডেটাস ঃ ইনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখার প্রচলন করেন। তাঁর লেখা থেকে প্রাচীন মিশর; সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। তিনি দেশে দেশে ঘুরে বিভিন্ন ঘটনা জেনে তারপর তা লিখতেন। পারস্যের সাথে গ্রীসের যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীস রাষ্ট্রগুলির মিলন তিনি চেয়েছিলেন। প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় তাঁর লিখিত বহু বিষয় কাজে লেগেছে।
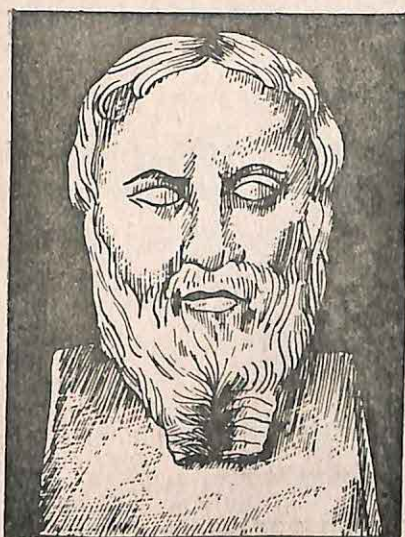
হেরোডেটাস

ম্যাসিডন—আলেকজাণ্ডার

গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের নাম তোমরা অনেকেই শুনেছ। গ্রীসে ম্যাসিডন নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন ফিলিপ। গ্রীসে তখন স্পার্টা ও এথেন্স নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মত্ত। ফিলিপ সেই সুযোগে নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন ও সবগুলি রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে সেখানকার রাজা হন। গ্রীস রাজ্যের সাথে যোগাযোগের ফলে এরা অনেক সভ্য হয়ে ওঠে। রাজা ফিলিপও থীবসে অনেক দিন কাটিয়ে গ্রীস সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হন। গ্রীস রাজ্যগুলি জয় করলেও সেখানের সভ্যতার উপর তিনি হাত দেন নি। গ্রীস রাজ্যগুলি জয় করার পর এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে পারস্য রাজ্য জয় করবেন বলে তিনি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু ম্যাসিডনেরই একজন সম্ভ্রান্ত লোকের হাতে তিনি নিহত হন। তিনি খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৩৫৯ থেকে খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৩৩৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার ঃ ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসেন। সে সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে তাঁর নাম প্রসিদ্ধ। পিতার সময় থেকেই তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হয়ে ওঠেন। বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিষ্টটল ছিলেন তাঁর শিক্ষক। দেখতেও তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তাঁর সাহস, রণকৌশল ও নেতৃত্বও ছিল তেমনি অপূর্ব। যুদ্ধের সময় তিনি সাধারণ সৈন্যের মত দুঃখ কষ্ট সহ্য করতেন। তাই সৈন্যগণ তাঁর খুব অনুগত ছিল ও তাঁকে খুব ভালবাসত। একুশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসে মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় তিনি নিজ প্রভাব বিস্তার করেন।

আলেকজাণ্ডার

বিজয় অভিযান ঃ পিতার কাছ থেকে আলেকজাণ্ডার পেয়েছিলেন সমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার আর সুশিক্ষিত সৈন্য দল। এই বিরাট সৈন্য-

বাহিনী নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী জয় করতে বেরোলেন। প্রথমে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও মিশর জয় করলেন। মিশরে তিনি একটি
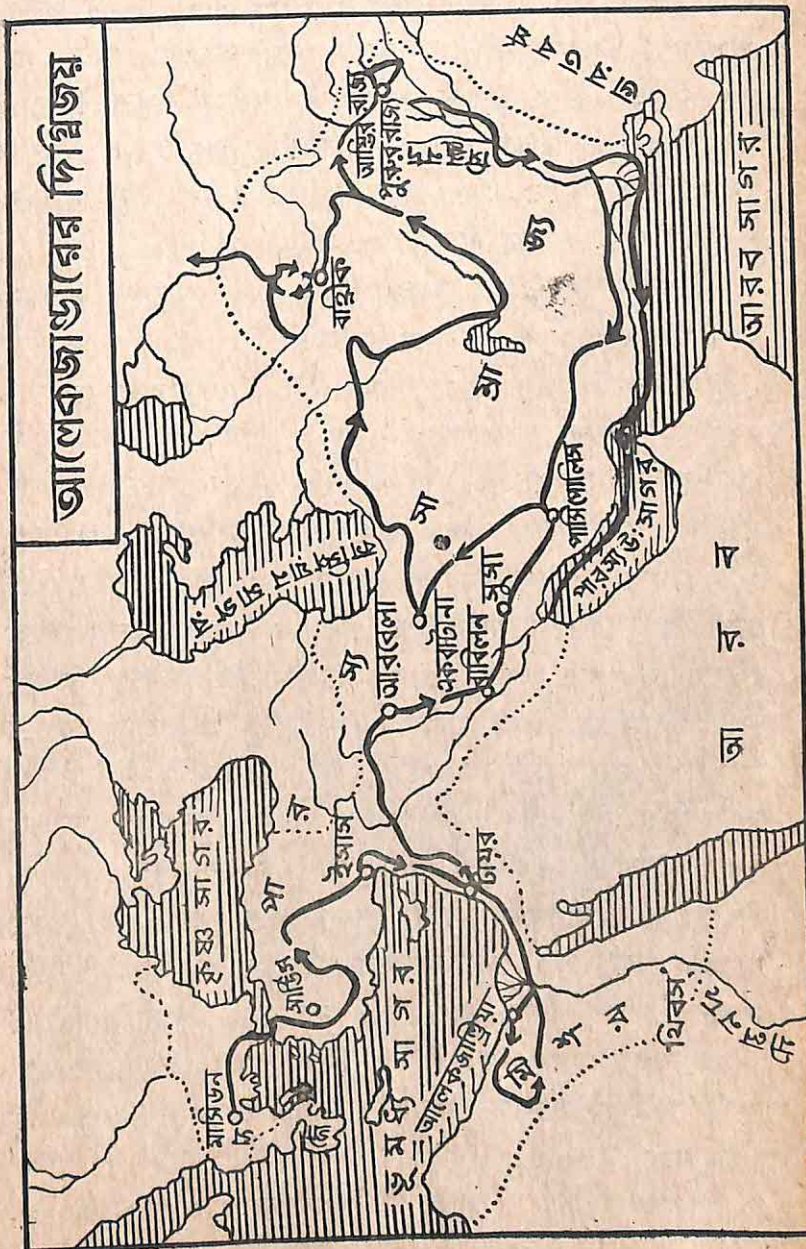
শহর নির্মাণ করেন। এর নাম দেওয়া হয় আলেকজেণ্ড্রিয়া। এবার তিনি ফিরলেন টায়ারের দিকে এবং মেসোপটেমিয়া বিনা বাধায় পার হলেন। সেই সময়ে পারস্যের রাজা ছিলেন তৃতীয় দারায়ুস। তাঁকে পরাজিত করে আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করলেন ও একজন উপযুক্ত শাসনকর্তা সেখানে বসিয়ে দিলেন। এর পরে তিনি যাত্রা করলেন পারসিপলিসের দিকে। সেখান থেকে ফিরে আবার উত্তর দিকে অভিযান করে পার্থিয়ানগণকে পরাজিত করে ভারতের দিকে অগ্রসর হলেন।

ভারত অভিযান ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তখন ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য ছিল। শক্তিশালী কোন বড় রাজ্য ছিল না। ৩২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ছোট ছোট রাজ্যগুলি দখল করেন। ৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে তিনি তক্ষশীলায় আসেন। সেখানকার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করলেন। এই সময় এই অঞ্চলে পুরু নামে এক বীর হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি অনেক সৈন্য জোগাড় করে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। ঝিলাম নদীর অপর পারে ছিল আলেকজাণ্ডারের বিরাট বাহিনী। কয়েকদিন ধরে তারা সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। একদিন রাত্রে চুপি চুপি নদী পার হয়ে তারা পুরুর সৈন্য দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অপ্রস্তুত অবস্থায় পুরুর সৈন্যগণ পরাজিত হল। পুরু নিজেও বন্দী হলেন। তাঁকে আলেকজাণ্ডারের কাছে আনা হলে তিনি বীরের মত ব্যবহার চাইলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। পুরুর বীরত্ব দেখে তিনি মুগ্ধ হন। আলেকজাণ্ডারের আরও রাজ্য জয়ের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পারস্যে বিদ্রোহের খবর পেয়ে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন। ব্যাবিলনে এসে অসুস্থ হয়ে তিনি মারা যান।

সাম্রাজ্যের পতন ও রোম কর্তৃক সাম্রাজ্য অধিকার ঃ আলেকজাণ্ডারের কোন সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। এর জন্য তাঁর

মৃত্যুর পরই তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় তাঁর সাম্রাজ্য তিনজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। টলেমি মিশরের সাম্রাজ্য পেলেন এবং নিজেকেই সেখানকার সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। এশিয়ার সাম্রাজ্য পড়ল সেনাপতি সেলুকাসের হাতে। কিছু দিনের মধ্যে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই রাজ্যগুলি দখল করে নেন। ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসের অন্যান্য রাজ্য এল সেনাপতি কাসাণ্ডারের হাতে।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীকদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলতেই লাগল। এর পর রোমানগণ সম্পূর্ণ গ্রীস দখল করেন।

অনুশীলনী

১। গ্রীস দেশে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। গ্রীসে হোমারের যুগ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। গ্রীস দেশে নগর রাষ্ট্রের প্রধান বিষয় কি কি? এই সময়ের উপনিবেশিকতা সম্পর্কে কি জান?

৪। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে বিরোধের কারণ কি? এই বিরোধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। এথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের কথা বল।

৭। এথেন্সের মহান সংস্কৃতি বিষয়ে কি জান? এখানে সাহিত্য, শিল্প এবং ধর্মের উন্নতির কথা সংক্ষেপে লিখ।

৮। ম্যাসিডন কোথায়? এখানে সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্রাটের নাম কি? তাঁর পৃথিবী বিজয় অভিযান সম্বন্ধে কি জান?

৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) হোমার কে ছিলেন? তাঁর প্রধান কাজ কি ছিল?

(খ) গ্রীস দেশের নগর রাষ্ট্রে অধিবাসীদের শ্রেণীবিভাগ কেমন ছিল?

(গ) এথেন্সের সাহিত্য সম্বন্ধে কি জান?

(ঘ) পেরিক্লিস ও সক্রেটিস কে ছিলেন?

(ঙ) আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

১০। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন দাও :

(ক) মহাকবি হোমার ছিলেন —— গ্রীস দেশের লোক / চীন দেশের লোক।

(খ) ইলিয়াড ও ওডেসী এই দুটি হল —— সাম্রাজ্যের নাম / মহাকাব্যের নাম।

(গ) গ্রীস দেশে চাষবাসের কাজে খুব উন্নতি করেছিল —— ডোরিয়ানগণ / রোমানগণ।

(ঘ) আলেকজাণ্ডার যে দেশের সম্রাট ছিলেন তার নাম —— নাইরোবি / ম্যাসিডন।

(ঙ) থিবস হল একটি —— রাজ্যের নাম / রাজার নাম।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ক্রীটদেশের রাজা মোনিয়ানের রাজধানী ছিল ——।

(খ) অ্যাপোলো হলেন —— দেবতা।

(গ) এথেন্সের গৌরব বৃদ্ধির মূলে ছিলেন ——।

(ঘ) আলেকজাণ্ডার ছিলেন রাজা —— পুত্র।

(ঙ) সোফোক্লিস ছিলেন একজন বিখ্যাত ——।

———

সপ্তম অধ্যায়	ক. রোম ও রোমান সাম্রাজ্য খ. জুলিয়াস সীজার

রোমের উদ্ভব ঃ মধ্য ইতালীর টাইবার নদীর তীরে রোম নগরী। রোমান সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় এই সভ্যতার ছাপ আছে। রোমানদের ধারণা তারা ট্রয়ের রাজা প্রায়ামের বংশধর। প্রায়ামকে গ্রীকরা ট্রয়ের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। এটা ইতিহাস নয়, ধারণা মাত্র।

সম্ভবতঃ ১২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির একটি শাখা এখানে এসেছিল। ট্রোজানরাও ইন্দো-ইউরোপীয়ান জাতির বংশধর। এই হিসাবে রোমানদের ধারণা সত্য হতে পারে। এদের মধ্যে এস্ট্রাসকান ও ল্যাটিন শাখার লোকেরা টাইবার নদীর তীরে ও ইতালীর পশ্চিম অংশে বসবাস গড়ে তোলে। এই অঞ্চলেই ভূমি উর্বর, চাষের খুব উপযোগী। খাদ্যশস্য, আলু ও জলপাই এখানে প্রচুর ফলত। পশুচারণের মাঠের অভাবও এখানে ছিল না। তাই তারা স্থানটি পছন্দ করেছিল।

প্রাচীন কাহিনী অনুসারে রোম নগরী স্থাপিত হয়েছিল ৭৫৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। **রোমিউলাস্** এই রাজ্যের প্রথম রাজা। তাঁর নাম অনুসারে রাজ্যের নাম দেওয়া হয়েছে রোম। পালাটাইন পাহাড়ের উপর ছিল তাঁর সুন্দর রাজপ্রাসাদ। ৭১৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে যুদ্ধ করে তিনি অনেক স্থান দখলও করেছিলেন। রোমিউলাসের সম্বন্ধে রোমে এক কাহিনী প্রচলিত আছে। রোমিউলাস ও রেমাস দুই ভাই-এর মায়ের নাম রিয়া। তিনি যুদ্ধের দেবী মার্সের প্রিয় পাত্রী ছিলেন। দেবতাদের চক্রান্তে দুই ভাইকে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভাসতে ভাসতে তারা এক বনে আসে, সেখানে এক নেকড়ে স্তন্য পান করিয়ে এদের বাঁচায়। একটু বড় হয়ে এরা এক মেষপালকের কাছে মানুষ হয়। সব জানতে পেরে তারা রোমের রাজত্ব দাবী করে ও এখানকার রাজা হয়। একদিন দুই ভাইয়ের

ঝগড়ার সময় রোমিউলাস রেমাসকে হত্যা করে নিজেই রাজা হয়। এস্ট্রাসকান জাতির লোকেরাই রোমের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে।
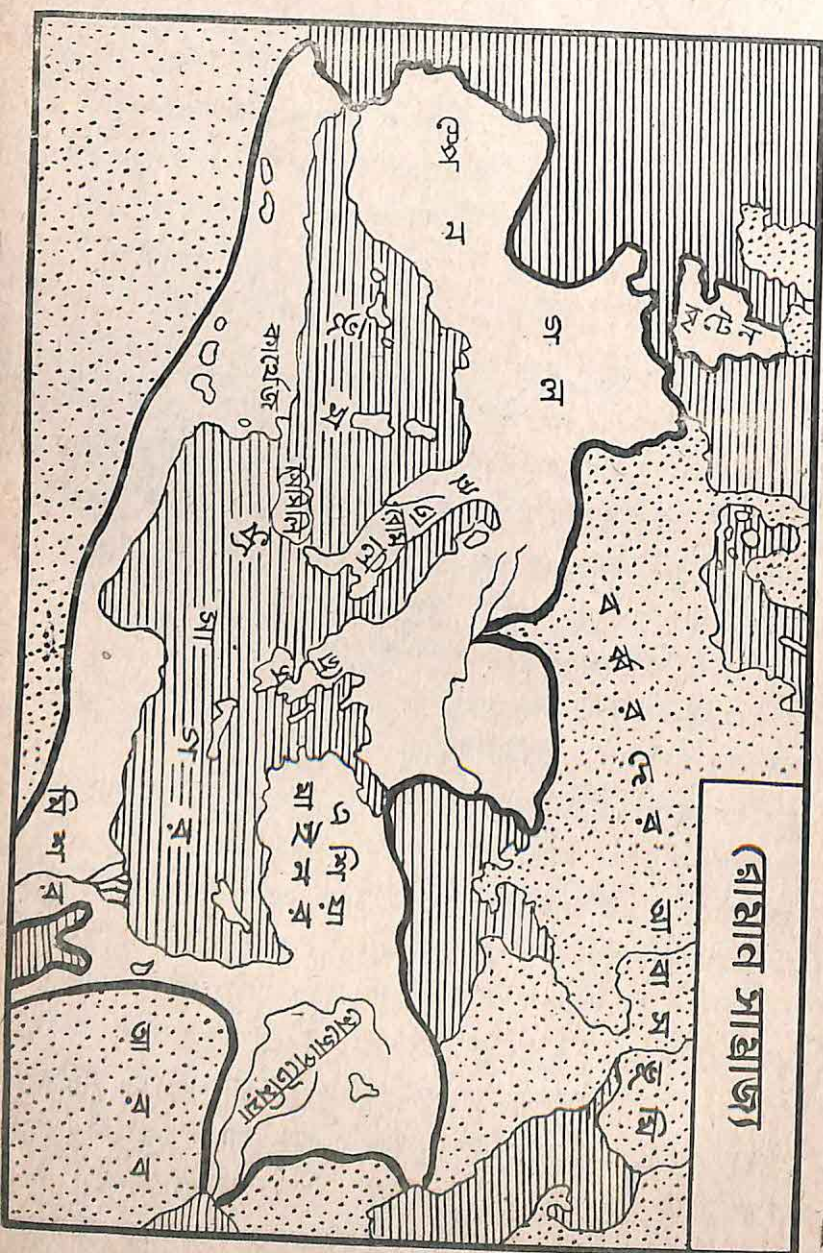
এখানকার ভাষা ল্যাটিন। খৃষ্ট পূর্ব ৫০০ সালে এদের বিরুদ্ধে

অসন্তোষ দেখা দেয়। ল্যাটিন জাতির লোকেরা বিদ্রোহ করে; ফলে এখানে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

কার্থেজের সাথে যুদ্ধ : রোমের প্রতিবেশী রাজ্য কার্থেজ। ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল কার্থেজবাসীর জীবিকা। রোমের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষিকাজের উপরই নির্ভর করত। এই দুই জাতির মধ্যে ঝগড়ার কোন কারণ ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কার্থেজ ক্রমে উপনিবেশ গড়ে তুলল—স্পেনের দক্ষিণে আর সিসিলিতে। এদের নৌবাহিনী ছিল খুব শক্তিশালী। রোমও সমগ্র ইতালীতে রাজ্য বাড়াল। এখানকার লোকেরা সিসিলির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আরম্ভ করল। কার্থেজবাসীরা এটা সহ্য করতে পারল না। রোম কার্থেজে সৈন্যদল পাঠাল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হল। প্রথম দিকে রোমের সৈন্যরা সুবিধা করতে না পারলেও তারাই জয় লাভ করল। এই যুদ্ধ কুড়ি বছর ধরে চলেছিল—একে প্রথম পিউনিকের যুদ্ধ বলে। সিসিলি ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তারা সার্ডিনিয়া ও কোর্সিকা নামে দুটি রাজ্যও পেল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে কার্থেজকে অনেক টাকা দিতে হল।

যুদ্ধে হেরে গিয়ে কার্থেজ তার শক্তি বাড়াতে আরম্ভ করল। তারা সার্ডিনিয়া দ্বীপ অধিকার করল। রোমও অধিকার করল স্পেনের দক্ষিণ ভাগ। ২৩ বছর পর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। রোমের সৈন্যবাহিনী স্পেনে কার্থেজের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করল। এই সময় কার্থেজের এক তরুণ নেতা দেখা দিল। তার নাম হানিবল। তিনি চেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডারের মত পৃথিবী জয় করবেন। তাঁর সৈন্যদলও বিরাট ছিল। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ৫০,০০০ সৈন্য ছিল। তাছাড়া অশ্বারোহী সৈন্য ও হাতি ছিল। এই বিরাট সৈন্যদল

হানিবল

নিয়ে স্পেন পার হয়ে তিনি উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করলেন ও আল্‌পস্‌

পর্বত পার হয়ে ইতালীতে পৌঁছালেন। হানিবলের সৈন্যদলের সামনে রোমের সৈন্য টিকতে পারল না। রোমবাসীরা ভয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। রোম নগর ছাড়া গোটা ইতালী হানিবলের হাতে এল। ম্যাসিডোনিয়াও রোমকে সাহায্য করল না। তারা দাস ও ছেলেদের নিয়ে সৈন্যদল তৈরী করে যুদ্ধ চালাতে লাগল। অনেক দিন যুদ্ধ চলার পর হানিবলের রসদ ফুরিয়ে গেল। তিনি কার্থেজে খবর পাঠালেন রসদ আর সৈন্যের জন্য। তাঁর এক ভাই সৈন্য নিয়ে স্পেন থেকে আসার পথে রোমানদের হাতে মারা গেলেন। রোমের সৈন্যাধ্যক্ষ একটা মতলব আটলেন। তিনি স্পেন আক্রমণ করে হানিবলের রসদ ও সৈন্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকাও আক্রমণ করলেন। কার্থেজ রাজ্য তখন হানিবলকে দেশে ফিরে আসতে বলল। রোমের সৈন্যাধ্যক্ষ সিপিও ২০২ খৃষ্টপূর্বাব্দে জামার যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করলেন। রোম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল।

এর পরও কার্থেজ ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে লাগল। কার্থেজ যখন উত্তর আফ্রিকাবাসীদের আক্রমণ ঠেকাতে চেষ্টা করল তখন রোমানরা বলল যে কার্থেজ সন্ধির সর্ত ভেঙ্গেছে। এই অজুহাতে আবার তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলল। ১৪৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোম কার্থেজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করে দিল।

রোমের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ঃ প্রাচীন রোম সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল।

প্যাট্রিসিয়ান ঃ অভিজাত বা ধনী শ্রেণীর লোকেদের দেশের শাসন ব্যাপারে হাত ছিল। এরা রাজাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। এসেমব্লী বা পরিষদের সভ্য এঁরাই হতেন। জমির মালিক না হলে কেউ শাসন পরিষদের সভ্য হতে পারত না। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে এদের নজর ছিল না। এঁদের প্যাট্রিসিয়ান বলা হত। এঁরা খুব ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন।

প্লেবিয়ান ঃ দেশের সাধারণ মানুষ, চাষী, মজুর, মুক্তি পাওয়া দাস ও বিদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই ছিলেন এই শ্রেণীর লোক।

দাসগণ হলেন তৃতীয় শ্রেণীর লোক। এরা সব রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এখানে প্যাট্রিসিয়ান বা প্লেবিয়ান বলে কিছু ছিল না। যুদ্ধ জয় করে যা কিছু পাওয়া যেত এরা তা ভাগ করে নিত।

এই শ্রেণীভেদের ফলে দেশে অনেক অসন্তোষ দেখা দেয়। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা খুব ধনী হয়ে উঠেছিলেন। সেনেটের সভ্য হতে হলে জমির মালিক হতে হত। বেশীর ভাগ প্লেবিয়ানদের সে ক্ষমতা ছিল না। ল্যাটিন জাতির লোকেরা এই সময় রোমে হানা দেয়। প্লেবিয়ানগণ দেশ ছেড়ে চলে যেতে লাগলেন। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ভয় পেয়ে অনেক বুঝিয়ে এদের ফিরিয়ে আনলেন। ফিরে এসে তারা ল্যাটিন জাতির বিরুদ্ধে যোগ দেয়।

৫১০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে দুইজন প্যাট্রিসিয়ান নেতা ক্ষমতা দখল করে রাজাকে তাড়িয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই দেশে অভিজাত-তন্ত্রের শাসন আরম্ভ হয়েছিল। দুইজন কন্‌সল (নেতা) দেশ শাসনের অধিকার পান। এরা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন। প্লেবিয়ানদের বিদ্রোহের ফলে রোমে আর একটি সুবিধা হয়েছিল। রোমের আইন তৈরী হল গ্রীস দেশের আইনের ছাঁচে। ১২টি ব্রোঞ্জের ফলকে লিখে সেগুলি প্রকাশ্য স্থানে বসান হল। প্লেবিয়ানগণ দেশের শাসন পরিষদে নির্বাচিত হতে পারবেন বলেও স্থির হয়। প্লেবিয়ান ও প্যাট্রিসিয়ানদের মধ্যে বিবাহও চলতে পারবে।

নাগরিক অধিকার ঃ রোমের শাসন-ব্যবস্থা নামে মাত্র প্রজাতান্ত্রিক ছিল। আসলে অভিজাত শ্রেণীর শাসনই এখানে চলত। বহুকাল ধরে শুধু এই শ্রেণীর লোকেরাই নাগরিক অধিকার অর্থাৎ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে অধিকার ভোগ করত। জমির মালিকরাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারত। প্লেবিয়ানগণ শুধু পরিষদের সভ্য হতে পারতেন। নানা বিদ্রোহের ফলে তারা কিছু কিছু অধিকার অর্জন করে; কিন্তু দাসগণ কোন দিনই এই অধিকার পায় নি।

দাসত্ব প্রথা ও দাস বিদ্রোহ ঃ রোমের বীরত্ব, প্রজাতান্ত্রিক

শাসন-ব্যবস্থা, এখানকার শিক্ষা ও সভ্যতার কথা শুনে তোমাদের মনে হবে যে এখানকার লোকেরা খুব সুখে শান্তিতে বাস করত। একথা মোটেই ঠিক নয়।

রোমের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার মূলে দাসদের স্থান সবার উপরে। যুদ্ধের বন্দীরাই দাস হত। এক একটা দেশ জয় করে অনেক লোককে বন্দী করে আনা হত। এদের উপর রোমানদের কোন দয়া-মায়া ছিল না। কার্থেজ দখল করে রোমে অনেক দাস আনা হয়েছিল। এমনি আনা হয়েছিল ইতালীর অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে। ক্রীতদাসদের, মালিকরা দাসদের পশুর মত খাটাত। খাটতে খাটতে যখন এরা মরে যেত তখন নতুন দাস কিনে আনা হত বাজার থেকে—একথা শুনলে তোমরা অবাক হবে। দাস কেনা-বেচা এখানকার প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ এরাই রোমের সৈন্য-বাহিনীতে যুদ্ধ করে দেশ জয় করত। অনেক দিন ঘরবাড়ী ছেড়ে তাদের বিদেশে থাকতে হত। রোমের বড় বড় রাজপ্রাসাদ, রাস্তাঘাট সবই এদের তৈরী। কোন কোন শাসক শ্রেণীর লোক দয়া পরবশ হয়ে এদের উন্নতির জন্য কিছু কিছু আইন করেছিলেন, কিন্তু এতে তেমন ফল হয়নি। এই আইনগুলির একটি হল একজন লোক কতখানি জমি রাখতে পারবে তা ঠিক করে দেওয়া। দাসগণ প্রভুর জমি চাষ করত, রাস্তাঘাট তৈরি করত, মজুরের কাজ করত। সে সময় গ্রীসের ধনী ব্যক্তিরা আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধূলার প্রদর্শনী করতেন। এখানে একটি খেলা হতো পশুর সাথে মানুষের লড়াই। দাসদের পাঠানো হতো পশুর সাথে লড়তে। যারা পশুর সাথে লড়তো তাদের

রোমান ক্রীতদাস

গ্লাডিয়েটর বলা হত। পশুর সাথে লড়াই করে এরা প্রাণ হারাত। এই দৃশ্য অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা দেখত।

দাস-বিদ্রোহ: কোন কাজে দাসদের প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। প্রতিবাদ করতে গেলেই তাদের কঠোর শাস্তি পেতে হত। তবু যে বিদ্রোহ হতো না তা নয়। অনেক সময় দাসরা বিদ্রোহ করত। এমনি একটা বিদ্রোহ হয়েছিল খৃষ্ট পূর্ব ৭৩ সালে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন **স্পার্টাকাস**। তিনি একজন গ্লাডিয়েটর ছিলেন—অর্থাৎ পশুর সাথে তাঁকে লড়াই করতে হত। ৭০ জন সাথীকে নিয়ে প্রভুর খামার থেকে তিনি পালিয়ে যান। আরও অনেক লোক জোগাড় করে তিনি বেশ বড় একটা দল করেছিলেন। পাহাড়ের গায়ে নিরাপদ স্থানে ছিল এদের আস্তানা। দাসদের মুক্ত করে দেওয়াই ছিল এদের কাজ। দু'বছর ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল। তারপর রোমের সৈন্যবাহিনী এদের পরাজিত করে। স্পার্টাকাসের দলের ছয় হাজার লোককে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়।

জুলীয়াস সীজার: প্রজাতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পরেই দেশের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকে। দেশের সবাই ধনী হতে চায়। সব কর্মচারী অসাধু হয়ে পড়ে। আইন-কানুন বলে কিছু নেই। এই সময় বর্বর জাতির লোকেরা সুবিধা পেলেই রোমে এসে হানা দিতে থাকে। শক্ত হাতে দেশ শাসন করতে পারে এমন একজন লোকের দরকার হল। এই সময় রোমে একজন শক্তিমান নেতার আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম **জুলীয়াস সীজার**। খৃষ্ট পূর্বাব্দ ১০০ সালের কাছাকাছি এক প্যাট্রিসিয়ান পরিবারে এঁর

জুলীয়াস সীজার

জন্ম হয়। দেখতেও তিনি যেমন সুপুরুষ ছিলেন তাঁর শক্তি, সাহসও তেমনি প্রশংসার বিষয় ছিল। তিনি ঘোড়া চালাতেও ওস্তাদ ছিলেন। ভাল বক্তৃতাও করতে পারতেন। সৈন্যদের সাথে সব দুঃখ কষ্ট স্বীকার করেছেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক হলেও গরীবদের উপর তাঁর দরদ কম ছিল না।

পম্পি নামে এক সেনানায়ক ও ক্রাসাস নামে এক ধনী ব্যক্তিকে সঙ্গে করে তিনি রোমে তিনজন নেতার শাসন-ব্যবস্থা চালু করেন।

যুদ্ধ না করলে তিনি বড় হতে পারবেন না একথা তিনি বুঝে-ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে গল ও বৃটেনের বিরুদ্ধে তিনি অগ্রসর হন। নয় বছর এই সব দেশে যুদ্ধ করার ভিত্তিতে নানা বীরত্বের কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু যখন তিনি দেশে ফিরে আসছিলেন তখন শুনতে পেলেন যে রোমের সেনেট তাঁকে দেশের শত্রু বলে ঘোষণা করেছে। রোমের কতক লোকদের ধারণা যে সীজার প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চান। সীজারের বন্ধু পম্পিও এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। সেনেট সীজারকে আদেশ দিল যে তাঁকে সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তাঁকে একাই দেশে আসতে হবে। তা না হলে তাঁকে দেশের শত্রু বলে ধরা হবে ও তাঁর বিচার করা হবে। সীজার খুব বিপদে পড়লেন। অনেক চিন্তা করার পর তিনি যুদ্ধ করাই ঠিক করলেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি রোমের দিকে এগোতে লাগলেন। সীজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছেন শুনে তাঁর বিপক্ষের লোকেরা রোম ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল। পম্পি মিশরে পালিয়ে গেলেন। সীজার বীরের মত রোমে প্রবেশ করলেন। রোমের কোন লোককে তিনি কোন শাস্তি দিলেন না। এর পর মিশর, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ জয় করে রোমকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করলেন। খৃষ্ট পূর্ব ৪৫ সালে তিনি রোমের সর্বময় কর্তা হলেন। রোমের সেনেট তাঁকে সারা জীবনের জন্য ডিক্‌টেটর বা সর্বময় কর্তা বলে মেনে নিলেন।

রোমান সাম্রাজ্য ঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে পার্থিয়, অপর দিকে জিব্রাল্টার থেকে প্যালেষ্টাইন পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

দেশে নানা উন্নতিমূলক কাজও তিনি করেছিলেন। আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ইতালী ও অন্যান্য স্থানে উপনিবেশ—এইগুলি তার মধ্যে প্রধান। সেনেটের সদস্য সংখ্যা বাড়ান হয়। ইতালীর যে কোন লোক রোমের নাগরিক হতে পারবে বলে স্থির হল। দেশে অনেক বড় বড় বাড়ী ও রাস্তাঘাটও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন।

কিন্তু সীজারের সব ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারল না। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছিল। রোমের সেনেটের কয়েকজন সভ্য ঈর্ষাপরবশ হয়ে উঠেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মার্চ মাসে পম্পিয়াসের হলে তাকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে সীজার একজন নাম করা লোক, তিনি আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ানের মতই বীর ছিলেন।

নতুন সাম্রাজ্য—অধঃপতন ও ধ্বংস: সীজারের মৃত্যুর পর রোমে ক্ষমতা দখলের লড়াই আরম্ভ হয়। কিছুদিন লড়াই চলার পর সীজারের মনোনীত **অক্টেভিয়ান** জয়ী হন। তিনি খুব চতুর ছিলেন। তিনি বললেন যে তিনি সর্বময় কর্তা হতে চান না। রোমের লোকেরা তাঁকে 'আগাষ্টাস' বা সম্মানিত ব্যক্তি আখ্যা দিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সীজার বা সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন। এইভাবে রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটল ও নতুন সাম্রাজ্য আরম্ভ হল। অক্টেভিয়ান চেয়েছিলেন দেশের লোকেরা সুখে শান্তিতে বাস করুক, আর দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসুক।

তাঁর সময়ে দেশের অনেক উন্নতি হয়। অক্টেভিয়ানের পর আরও কয়েকজন রাজা সুনামের সাথে রাজত্ব করেন। কিন্তু এই সময়ে অর্থাৎ ৬৪ খৃষ্টাব্দে রোমে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। সাতদিন ধরে এই আগুন নেভেনি। এই সময় রাজা ছিলেন **নীরো**। তিনি আগুন নেবাবার কোন চেষ্টাও করেন নি। আবার নতুন করে রোমনগরী নির্মাণ করেন। দেশ শাসন অপেক্ষা গান-বাজনা প্রভৃতিতেই তাঁর মন ছিল বেশী। দেশের লোককে খুশী করার জন্য অনেক খৃষ্টান ধর্মের লোককে হত্যা করা হয়। তাদের ধারণা খৃষ্টানরাই রোমে আগুন ধরিয়েছিল। রোমের

শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য, কর্মহীনতা বাড়তে লাগল। রোমের সম্রাটরা বিলাসিতায় মত্ত থাকতেন।

ধীরে ধীরে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘনিয়ে এল। রোমের সাম্রাজ্য যেমন একদিনেই গড়ে ওঠেনি, এর পতনও একদিনেই হয়নি। সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের সময় রোমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। এর ফলে রোমের অনেক ক্ষতি হয়। দেবতার কোপে এই দুর্যোগ হয়েছে মনে করে খৃষ্টানদের উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়। খৃষ্টান ও রোমানদের মধ্যে বিবাদ বাড়তে থাকে। সুযোগ
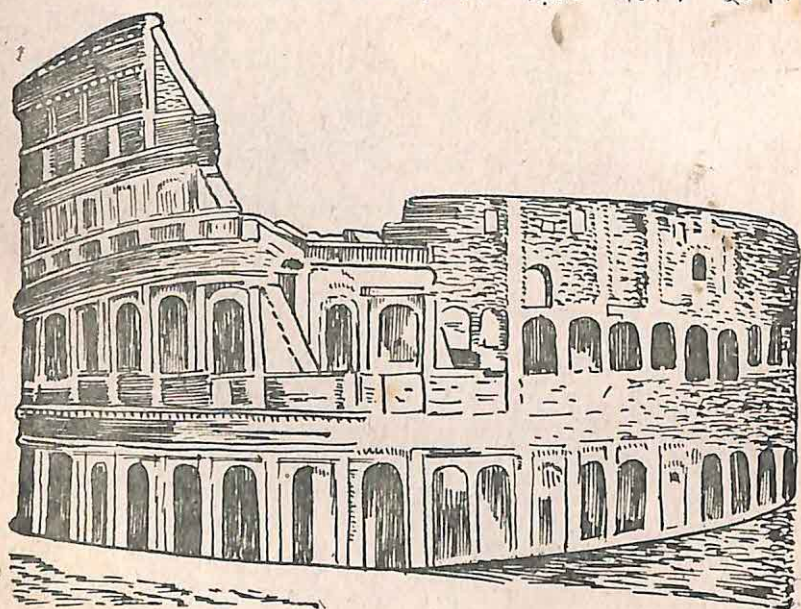
কলোসিয়াম (অভিনয় মঞ্চ)

পেয়ে বর্বর জাতির লোকেরা এখানে আসতে লাগল। রাজা কনস্টানটাইন রাজধানী সরাতে বাধ্য হলেন। তাঁর রাজধানী হল বাইজেন্টাইন নগরে। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রাজার নাম অনুসারে এর নাম হল কনস্টান্টিনোপল। এই ভাবে রোম সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে রোম, অপর ভাগে কনস্টান্টিনোপল। এরপর আর তেমন ভাল রাজা রোমে জন্মগ্রহণ

করেননি। ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, লম্বার্ড প্রভৃতি বর্বর জাতির লোকেরা রোম সাম্রাজ্য হানা দিতে থাকে। গথগণও এসে রোমে আশ্রয় নেয়। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান জাতির এক নেতা রোমের রাজাকে হারিয়ে দেয়। এই ভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও এর প্রভাব নষ্ট হয়নি। রোমান সভ্যতার অনেক কিছু এখনো টিকে আছে। অক্টেভিয়ানের সময় রোমে শিল্পকলা, অভিনয়, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়েছিল। রোমে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কলোসিয়াম অভিনয় মঞ্চ স্থাপিত হয় এবং এতে বহু কলাকুশলী তাদের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। সে-সব গৌরব-কাহিনী এখনও জনমনে জাগরূক।

খৃষ্ট ধর্মের উত্থান ঃ রাজা টাইবেরিসের রাজত্বকালে রোমানরা খৃষ্টান ধর্ম ও খৃষ্টান জাতি সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে পারে। সম্রাট নীরোর সময় অকারণে অনেক খৃষ্টানকে হত্যা করা হয়। এই খৃষ্টান কারা? খৃষ্ট ধর্ম বলতে কি বোঝা যায়?

খৃষ্ট ধর্মের স্রষ্টা হলেন যীশুখৃষ্ট। জেরুজেলামের কাছে বেথেলহাম বলে একটা জায়গায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সূত্রধর। ছোটবেলায় যীশুও এই কাজই শিখেছিলেন। ক্রমে তিনি বুঝতে পারেন যে কোন মহৎ কাজ করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন। প্যালেস্টাইনের মরুভূমি অঞ্চলে চল্লিশ দিন ধরে সাধনা করার পর তিনি ফিরে আসেন—আর ধর্মের নতুন কথা শোনান। এই সময় তাঁর অনেক শিষ্য জুটে

যীশুখৃষ্ট

যায়। যীশু বললেন, ভগবান এক। মানুষকে ভালবাসাই ধর্ম। সৎ পথে চলা, সকলকে শ্রদ্ধা করা, অহিংসা প্রভৃতি এই ধর্মের মূল কথা। যীশুর শিষ্যরা তাঁর উপদেশ প্রচার করতে আরম্ভ করে দিলেন। এর ফলে ইহুদীরা তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়। কারণ তাদের ধর্মে যা নেই যীশু সেই কথাগুলি বলছেন। যীশুর শিষ্যরা তাঁকে 'ত্রাণকর্তা', 'ঈশ্বরের পুত্র' প্রভৃতি বলত। ইহুদীরা এটা সহ্য করতে পারল না। ইহুদীরা তাঁকে ধরে রোমান শাসনকর্তা পন্টিয়াসের কাছে নিয়ে গেল। বিচারে যীশুর শাস্তি হল। ক্রুশে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করা হল।

যীশুর উপদেশগুলি তাঁর শিষ্যরা প্রচার করতে লাগল। এগুলি লিখে যে বই তৈরি হল তার নাম 'বাইবেল।' খৃষ্ট ধর্মের উপদেশগুলি বাইবেলে লেখা আছে।

যীশুর শিষ্যদের মধ্যে 'পল'ই প্রধান। তিনি ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। শীঘ্রই রোমানদের সাথে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হয়। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ফলে রোমানদের খুব ক্ষতি হচ্ছিল। মানুষকে ভালবাসাই হল এই ধর্মের নীতি। কোন লোককে দাস করে রাখা অন্যায়। অথচ দাস না হলে রোমানদের চলত না। তাছাড়া রোমানরা অনেক দেব-দেবীর পূজা করত। খৃষ্টানগণ এর বিরোধী। যীশুর শিষ্যরা নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সাধারণ মানুষের কাছে খৃষ্ট ধর্মের কথা প্রচার করতো। যীশুর দুই প্রধান শিষ্য পল ও পেটারকে রোমানরা বন্দী করে রাখল। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মের প্রচার বন্ধ হল না। পল ও পেটার খৃষ্ট ধর্মের শহীদের সম্মান লাভ করলেন।

ক্রমে বিভিন্ন দেশে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসার বাড়তে লাগল। জনসাধারণ এই ধর্মের উদার নীতিগুলি সহজেই গ্রহণ করল।

অনুশীলনী

১। রোম সাম্রাজ্যের উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল ? এবিষয়ে যা জান লিখ।

২। কার্থেজের বিরুদ্ধে রোমের যুদ্ধ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। রোমের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ে যাহা জান লিখ।

৪। দাসত্ব প্রথা কি ? রোমের দাসত্ব প্রথা এবং দাস-বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। জুলিয়াস সীজার কে ছিলেন? তিনি রোম সাম্রাজ্যে কি করেছিলেন ?

৬। রোমে খ্রীষ্ট ধর্মের উত্থান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :

(ক) প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কি ?

(খ) দাসত্ব প্রথা কি ?

(গ) গ্লাডিয়েটর কাদের বলা হত ?

(ঘ) নীরো কে ছিলেন ? তিনি কি করেছিলেন ?

(ঙ) কার্থেজ কোথায় ছিল ?

৮। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও :

(ক) রোম কার্থেজকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত — করে ছিলে / করতে পারে নাই।

(খ) প্যাট্রিসিয়ানরা ছিল — অভিজাত শ্রেণীর লোক / সাধারণ শ্রেণীর লোক।

(গ) জুলিয়াস সীজার ছিলেন — চীনদেশের মানুষ / রোমের মানুষ।

(ঘ) রোমের সভ্যতা ছিল খুব — নিম্ন স্তরের / উচু স্তরের।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) রোমের প্রথম রাজার নাম —।

(খ) রোমের দাস-বিদ্রোহের নায়ক ছিল —।

(গ) সীজারের মৃত্যুর পর ক্ষমতার লড়াইয়ে — জয়ী হন।

(ঘ) খৃষ্ট ধর্মের স্রষ্টা হলেন — ।

(ঙ) মধ্য ইতালীর — নদীর তীরে রোম নগরী অবস্থিত।

অষ্টম অধ্যায়	ক. মহান শাং ও চীনদেশ খ. কনফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশ গ. চীনের প্রাচীর ও চীন সাম্রাজ্য

চীনদেশ

মহান শাং ঃ ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বত। এর পরই চীন দেশ। চীনের হিয়া বংশের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে ১৭৬৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সাং বংশের প্রতিষ্ঠা করেন টিয়াং (T' Ang) নামে এক শক্তিশালী রাজা। ইয়াংসি নদীর উত্তর দিক থেকে তিনি আসেন। তাঁর সময় চীন দেশের খুব উন্নতি হয়। দেশবাসী তাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁকে বলা হয় **মহান রাজা**। চীনে তিনি নতুন সমাজ-ব্যবস্থা ও ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগ করেন। এই ব্যবস্থায় দেশের সমস্ত জমির মালিক হলেন রাজা। তিনি জমিগুলি ভাগ করে দিলেন তাঁর অনুগত সামন্তদের মধ্যে। তারা আবার ছোট চাষীদের মধ্যে জমি ভাগ করে দিল। এই ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ধরনের। এর থেকে দেশে ধনী শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হয়। সামন্তরা রাজাকে পরামর্শ দিতেন ও যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি জলসেচের ব্যবস্থা করেন। গ্রামগুলি ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়।

সমাজ-ব্যবস্থা ঃ এই সময় চীনের সমাজে তিন শ্রেণীর লোক বাস করত। প্রথম শ্রেণীতে থাকতো সামন্তগণ ও সৈন্য বিভাগের কর্তারা; তারা ভাল বাড়ীতে বাস করত ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল রাজার কর্মচারীরা। তারা রাজাকে নানা কাজে সাহায্য করত। এরাও বেশ সুখে দিন কাটাত। এর পরের শ্রেণীতে থাকত ব্যবসায়ী, শিল্পী ও কৃষকগণ। এদের অবস্থা খুব ভাল ছিল বলা যায় না। অন্যান্য দেশের মত এখানেও দাস ছিল। এদের চিয়াং বলা হত। এই বংশের এক রাজা রাজধানী তৈরি করে তার নাম দেন 'সাং'। ১৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পে-কিং নামে এক রাজা রাজধানী সরিয়ে হোয়াং-হো

নদীর তীরে নিয়ে যান। এখানে খনন কাজের ফলে সে যুগের অনেক কিছু পাওয়া গেছে।

এই সময় এখানকার লোকেরা ধাতুর ব্যবহার জানতো। সৈন্যরা ছিল শক্তিশালী। তারা ব্রোঞ্জের তৈরী তীর, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করত। যুদ্ধের সময় ঘোড়া ও রথ ব্যবহার করত।

জীবিকা: কৃষি ও পশুপালনই ছিল এদের জীবিকা। ধান ও জোয়ার এখানে খুব উৎপন্ন হত। সম্ভবতঃ এই সময়েই এখানে রেশম তৈরি করার প্রথা চালু হয়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে থাকত ঘোড়া, কুকুর, গরু, ছাগল। টাকা পয়সা হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল। চিত্রলিপির সাহায্যে এরা লিখত। হাড়ের উপরে এই লেখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। খুব সম্ভব তুলি দিয়ে লেখার প্রচলনও এই সময় হয়েছিল। এখানকার লোকদের ভিতর পূর্ব-পুরুষদের পূজা করার প্রথা ছিল। মানুষ মরে গেলে সে দেবতা হয়ে যায়—এই ছিল তাদের ধারণা। ১১২৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এই রাজবংশের রাজারা পরাজিত হন। এর পর চাউ বংশের রাজারা রাজত্ব দখল করেন। চাউ বংশের রাজাদের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়। এই উন্নতির মূলে ছিলেন এখানকার জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন কন্‌ফুসিয়াস।

চাউ যুগের শিল্প

কন্‌ফুসিয়াস ও তাঁর উপদেশ: কন্‌ফুসিয়াস সম্ভবতঃ ৫৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৪৮০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর চেহারা নাকি কদাকার ছিল; কিন্তু তিনি খুব সরল ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বহুদিন চাউ সম্রাটের অধীনে কাজ করেছিলেন। দেশের লোকের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে চীনাদের অনেকে তাঁর কাছে আসতেন। এই ভাবে তাঁর অনেক শিষ্য হয়। কন্‌ফুসিয়াসের উপদেশগুলি প্রচার করাই এদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রচারের কাজে নামবার

আগে শিষ্যদের নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হত। তাঁর ধ্যান-ধারণা বুঝে নিয়ে নিজেকে উপযুক্ত হতে হত। কনফুসিয়াস নিজে কোন বই লেখেননি। তাঁর উপদেশগুলি সংগ্রহ করে শিষ্যগণ একটা বই লিখেছেন—একে **'কনফুসিয়াসের কথোপকথন'** বলে। যুক্তি বা তর্ক দিয়ে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোন কথা গ্রহণ করতেন না। ভগবান বা দেবতা সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। তাঁর উপদেশ হল সরল ও সুন্দর জীবন যাপন করা ও সব মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

কনফুসিয়াস

চীনের প্রাচীর ঃ চীনদেশে প্রায়ই বর্বর জাতির লোকেরা এসে হানা দিত। প্রধানতঃ মোঙ্গল জাতির লোকেরাই এই সময়
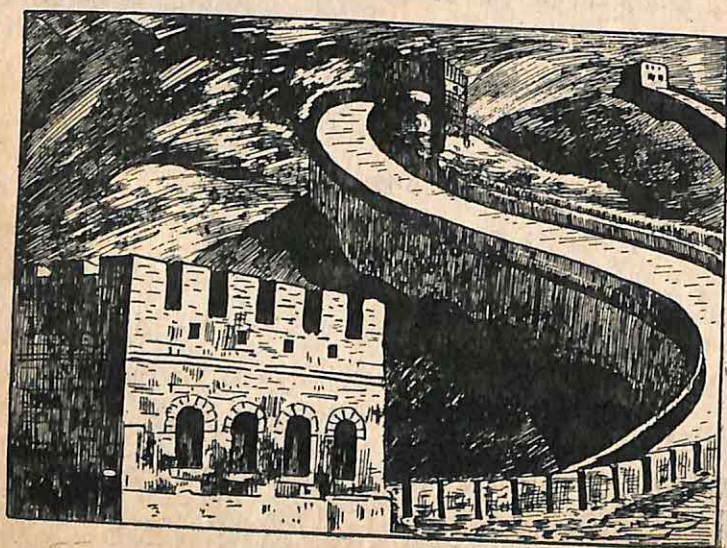
চীনের প্রাচীর

চীনে আসত। এরা যাতে এখানে আসতে না পারে সেজন্য চিন্ বংশের রাজা **চিন্-হোয়াংটি** এই প্রাচীর তৈরি করিয়েছিলেন। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীর প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা। সাগর থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রাচীরের উচ্চতা ২২ ফুট, মাঝে ৪০ ফুট উঁচু থামও অনেক আছে। এই প্রাচীর ২ ফুট চওড়া। প্রাচীন পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিসগুলির মধ্যে এটির নাম আজও আছে।

চীন সাম্রাজ্য ঃ তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দের শেষ দিকে চীনে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময় অন্যান্য ছোট রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে চীনবংশের রাজারা এখানকার রাজা হন। এই রাজবংশ ২৪৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ২০৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই বংশের চতুর্থ রাজাই হলেন প্রধান। তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। এর সময়ই চীনের প্রাচীর তৈরি হয়। তিনি চীনের আরও উন্নতি-মূলক কাজ করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয় চীনদেশ। তিনি নিজেকেই সর্বেসর্বা মনে করতেন। কন্‌ফুসিয়াসের উদার উপদেশগুলি তাঁর ভাল লাগেনি। তাঁর আদেশে দেশের সব বইগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। কেবল কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বই বাদ পড়ে। কন্‌ফুসিয়াস ও মেনিসাসের বইগুলিও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। কন্‌ফুসিয়াসের শিষ্যগণ আবার তাঁর উপদেশগুলি সংগ্রহ করে একত্রিত করে। বইগুলি পুড়ে যাওয়ায় চীনের খুব ক্ষতি হয়েছিল।

চিন হোয়াংটির কোন সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। কর্মচারীগণই শাসনকার্য চালাতেন। এতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শেষে ইয়াং-টি বংশের রাজারা এই রাজ্য দখল করে।

অনুশীলনী

১। মহান শাং কে ছিলেন? চীনদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি কি করেছিলেন?

২। মহান শাং-এর সময়ে চীনদেশের অবস্থা কেমন ছিল? সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। কন্‌ফুসিয়াস কে ছিলেন? তাঁর উপদেশগুলি আলোচনা কর।

৪। প্রাচীন চীন সাম্রাজ্যের একটি বিবরণ দাও।

৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও:

(ক) চীনের 'মহান রাজা' কে ছিলেন?

(খ) 'কন্‌ফুসিয়াসের কথোপকথন' বলতে কি বুঝ?

(গ) চীনের প্রাচীর কি?

(ঘ) চীনের প্রাচীর কে তৈরী করেছিলেন?

৬। সঠিক উত্তরের পাশে ✓ চিহ্ন বসাও:

(ক) চীনের প্রাচীর তৈরি করেছিলেন — কন্‌ফুসিয়াস / চিন্ হোয়াংটি

(খ) চীনে দাসদের বলা হত — চিয়াং / হোয়াং।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) চীনের শাং বংশের প্রতিষ্ঠা করেন — নামে এক রাজা।

(খ) — বংশের রাজারা চীন সাম্রাজ্য দখল করে।

———

নবম অধ্যায়	ক. আর্যদের আগমন ও সমাজ ব্যবস্থা খ. মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত গ. জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উত্থান ঘ. প্রাচীন সাম্রাজ্য ও প্রাচীন বাংলাদেশ ঙ. বিদেশী সভ্যতার প্রভাব ও বিদেশী পর্যটক চ. প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ভারত

আমাদের দেশ এই ভারত। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী আর মহাসাগরের অসীম জলরাশি দিয়ে সুরক্ষিত এই দেশ এককালে শস্যে শস্পে, সমৃদ্ধিতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ দলে দলে ভারতে হাজির হয়েছে। দুর্গম পর্বতের বাধা অতিক্রম করে অতি কষ্টে সেদিনের মানুষ ভারতে পৌঁছেছে। নানা দেশ, জাতি ও ধর্মের মানুষ কালক্রমে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই ভারতকে 'মহামানবের সাগর' বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। নানা দিক থেকে নানা নদ-নদী সাগরে এসে পড়ে। সাগরের জলের সাথে নদীর জল মিশে এক হয়ে যায়। প্রাচীনকাল থেকে অনেক দেশ থেকে অনেক জাতির লোক ভারতে এসেছেন। এখানকার লোকের সাথে তারা মিশে গেছেন। এমনি এক জাতির লোকের কথা আমরা আগেই শিখেছি। তাঁরা ছিলেন সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় তাঁরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন তা খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর থেকে ভাঙ্গতে শুরু করে ও দেড় হাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

আর্যদের আগমন ঃ এই সময় অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আর একদল লোক ভারতে আসেন। সম্ভবতঃ তাঁরা মধ্য এশিয়া অঞ্চলে বাস করত। সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফলে তাঁরা নানা দলে ভাগ হয়ে নানা দেশে চলে যান। এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে ভারতে

আসে। অন্য শাখাগুলি ইউরোপ ও পারস্যে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তারা আর্য ভাষায় কথা বলত। ল্যাটিন, গ্রীক, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে এখনও আর্য ভাষার অনেক মিল দেখা যায়। এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির লোকদেরই আর্য জাতি বলা হয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদীর উপত্যকা অঞ্চলে প্রথমে তাঁরা বাস করতে থাকে। পশুচারণই ছিল প্রথমে তাঁদের জীবিকা। ক্রমে এরা কৃষিকাজ শেখে ও ছোট ছোট গ্রাম গড়ে তোলে। এরা এই অঞ্চলের নাম দেয় **সপ্তসিন্ধু**। ধীরে ধীরে তারা উত্তর ভারতের প্রায় সব জায়গায় বসতি বিস্তার করে।

আর্যদের ভারতে আসার পূর্বেও এই সব অঞ্চলে মানুষ বাস করত। এদের অনার্য বলা হয়। অনার্যরা সহজেই আর্যদের জায়গা ছেড়ে দেয়নি। অনার্যদের সাথে আর্যদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রের সাহায্যে আর্য জাতি অনার্যদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। অনার্যদের অনেকেই পালিয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়; আর কেউ কেউ আর্যদের অধীনে থেকে যায়। এই ভাবে উত্তর ভারতের নতুন জায়গাগুলিতে আর্যগণ ছড়িয়ে পড়ে। এই সব অঞ্চল হল—কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কোশল, কাশী, বিদেহ, মিথিলা প্রভৃতি। পাঞ্জাব থেকে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী এই স্থানগুলির নাম হল আর্যাবর্ত।

বেদঃ আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। বেদ কথার অর্থ জ্ঞান। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বাস করার কিছুদিন পরে বেদ রচিত হয়েছিল। তখনও লেখার প্রচলন হয়নি। আর্য ঋষি বা পণ্ডিতগণ এগুলি মুখে মুখে শিখতেন ও শিষ্যদের এগুলি শেখাতেন। তাই একে শ্রুতি বলা হয়। সুতরাং কে বেদের মন্ত্রগুলি রচনা করেছিলেন তা বলা যায় না। আর্যদের ধারণা বেদের মন্ত্রগুলি কোন লোকের রচনা নয়। ঋষিরা ভগবানের কাছ থেকে এই মন্ত্রগুলি পেয়েছিলেন।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত—**ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব**। এগুলির মধ্যে ঋক বেদই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি

সম্বন্ধে লেখা, এতে ১০২৪টি স্তব আছে। সম্ভবতঃ ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের আগেই এগুলি রচিত হয়েছিল। সামবেদের মন্ত্রগুলি যজ্ঞ করার সময় গীত হত। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র ও নানা আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে। অথর্ববেদে আছে নানা উপদেবতার পূজার মন্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদির কথা। বেদের কবিতায় লেখা মন্ত্রগুলিকে সংহিতা বলে ও গদ্যে লেখা অংশকে ব্রাহ্মণ বলে। আর্যদের জীবনযাত্রার যা কিছু খবর তা বেদ থেকেই পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের সমাজঃ বৈদিক যুগের আর্যরা পরিবার ভুক্ত হয়ে বাস করতেন। পরিবারের কর্তা ছিলেন পিতা বা বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। কর্তার আদেশ পরিবারের সকলকে মেনে চলতে হত। যে অনার্য অধিবাসীরা এদের অধীনে থেকে গিয়েছিল তারাও এদের সাথেই বাস করত। অনার্যদের গায়ের রং ছিল কালো; এরা আকারেও ছিল অনেক ছোট। আর্যরা ছিল গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায়। সমাজে অনার্যদের স্থান ছিল অনেক নীচে। যাগ-যজ্ঞ বা ধর্ম-কর্মে এদের স্থান ছিল না। আর্যদের সেবা করাই এদের কাজ।

জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রমঃ জাতিভেদ বলতে আমরা যা বুঝি বৈদিক যুগে আর্যদের মধ্যে তা ছিল না। ফর্সা আর কালো এই দুই জাতির লোকই ছিল। সমাজে নানা ধরনের কাজ করার জন্য নানা দলের লোকের দরকার হত। এর ফলেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণের সৃষ্টি হল। এদের মধ্যে খাওয়াদাওয়া, বা অন্যান্য আচার-আচরণের কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। বৈদিক যুগের শেষের দিকে এই বর্ণ বিভাগ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। ব্রাহ্মণের কাজ ছিল যাগ-যজ্ঞ করা, লেখাপড়া শেখান প্রভৃতি। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করতেন। বৈশ্যগণের কাজ ছিল কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। আর শূদ্রগণ এই তিন জাতির সেবার কাজ করতেন।

জীবিকাঃ বৈদিক যুগে আর্যগণ গ্রামেই বাস করতেন। তখনও শহর গড়ে উঠেনি। কৃষিকাজ ও পশুপালনই ছিল এদের জীবিকা।

গ্রামে সব শ্রেণীর লোকই বাস করতো। নানা রকম শিল্পকাজ গ্রামের লোকেরাই করত। শিল্পগুলির মধ্যে কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ, কাঠের কাজ ও চামড়ার কাজই ছিল প্রধান। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও চলত।

খাদ্য ও পানীয়ঃ চাল, গম, যব প্রভৃতি এদের খাদ্য ছিল। দুধ, মাখন ও ঘি আর্যদের প্রিয় খাদ্য ছিল। আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাদ্যই প্রচলিত ছিল। পানীয়ের মধ্যে ছিল সোম ও সুরা। সোম হল একরকম লতার রস, আর সুরা হল মাদক দ্রব্য। যজ্ঞের সময় বিশেষ করে সোমরস পান করা হত। সুতী ও পশমী কাপড়ের ব্যবহার করা হত। পশুর চামড়া দিয়েও পোশাক তৈরি হত। মেয়েরা নানা রকম অলঙ্কার পরত। তাঁরাও লেখা-পড়া শিখতো। বেদের অনেক স্তব মেয়েরা রচনা করেছিল। নিষ্ক ও মানা নামে দু'রকম মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।

ধর্মঃ আর্যসমাজে ধর্মের স্থান খুব উচ্চে ছিল। প্রকৃতির নানা শক্তিকে দেবতা বলে কল্পনা করা হত। ইন্দ্র ছিলেন বজ্র ও

আর্যদের অগ্নিপূজা

বিদ্যুতের দেবতা, আকাশের দেবতাকে বলা হত 'দ্যৌ', জলের দেবতা ছিলেন বরুণ এবং আলোর দেবতা ছিলেন সূর্য। এই দেবতাদের স্তুতি গান করা হত। তাছাড়া আগুন জ্বেলে যজ্ঞ

করা হত। এই সময়ও অনেক মন্ত্র পাঠ করে আগুনে আহুতি দেওয়া হত। যজ্ঞের সময় পশুবলির প্রথাও ছিল। মৃত ব্যক্তিকে পোড়ান ও কবর দেওয়ার প্রথা ছিল। আর্য ধর্মকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এগুলিকে উপনিষদ বা বেদান্ত বলা হয়। এ ছাড়া নানা দর্শন ও ধর্মীয় গ্রন্থও এসময় রচিত হয়েছিল।

চতুরাশ্রমঃ আর্যরা সমগ্র জীবনকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন। গুরুগৃহেই লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ছিল। এই সময়টাকে **ব্রহ্মচর্য** বলা হত। বাড়ীতে নিজের নিজের কাজ করার সময়কে **গার্হস্থ্য** বলা হত। বেশী বয়সে ধর্ম চিন্তার সময় হল বানপ্রস্থ ও বাড়ী-ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে ঈশ্বর চিন্তার সময়কে **সন্ন্যাস** বলা হত। অনেক দেব-দেবীর পূজা করলেও আর্যগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন।

রাজনৈতিক জীবনঃ কতকগুলি পরিবার নিয়ে আর্যগণ গ্রামে বাস করতেন। গ্রামের প্রধানকে বলা হত **গ্রামণী**। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে বলা হত **বিশ**; এর প্রধান হলেন **বিশপতি**। কতকগুলি বিশ একত্র হয়ে গঠিত হত এক একটা বড় অঞ্চল। অঞ্চলগুলিকে বলা হত **জন**। জনের নায়ক ছিলেন **জনপতি বা রাজা**। সেনানী, পুরোহিত, গ্রামণী প্রভৃতি রাজাকে নানা কাজে সাহায্য করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় পুরোহিতের স্থান ছিল খুব উচ্চে। রাজার পদ প্রথম দিকে বংশানুক্রমিক ছিল না। কোন কোন অঞ্চলে রাজার শাসন ছিল না। দেশের লোকেরাই নেতা নির্বাচন করে দেশের শাসনব্যবস্থা চালাতেন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, যুদ্ধ পরিচালনা, ঝগড়া-বিবাদের বিচার প্রভৃতি রাজার হাতে ছিল। সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে কর আদায় করা হত। একে বলা হত **বলি**। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর করকে বলা হতো **শুল্ক**। এ ছাড়াও বিশেষ প্রয়োজনে রাজা **ভাগ** নামে একপ্রকার কর আদায় করতেন।

মহাকাব্যঃ রামায়ণ ও মহাভারতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য দুটির প্রভাব এদেশের অধিবাসীদের উপর খুব বেশী প্রভাবিত হয়েছে।

রামায়ণঃ সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ লিখেছিলেন আদি কবি বাল্মীকি। অনেকের ধারণা খৃষ্টজন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল। অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দশরথের তিন রাণীর চারটি ছেলে ছিল। বড় ছেলে রামের বিয়ে হয়েছিল বিদেহ বা মিথিলার রাজকন্যা সীতার সাথে। রামেরই রাজ্য পাওয়ার কথা। কিন্তু বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে তাকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়েছিল। ছোট ভাই লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁর সাথে বনে গিয়েছিলেন। পঞ্চবটী বনে বাস করার সময় লঙ্কার রাক্ষস রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যান। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব ও তার সেনাপতি হনুমানের সাহায্যে রাম লঙ্কায় গিয়ে যুদ্ধ করে রাবণকে হারিয়ে দেন ও মেরে ফেলেন। সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসে তিনি খুব ভাল ভাবে দেশ শাসন করতে লাগলেন। রামায়ণ বৈদিক যুগের শেষ দিকে লেখা হয়েছিল। রাক্ষস রাজা রাবণের সাথে রামের যুদ্ধ আর্য ও অনার্যদের মধ্যে যুদ্ধ বলে ধারণা করা হয়। এই সময়েই আর্যগণ দক্ষিণ ভারতে এমন কি লঙ্কা বা সিংহল পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে।

মহাভারতঃ মহাভারত রামায়ণের চেয়ে অনেক বড়। পৃথিবীতে এত বড় কাব্যগ্রন্থ আর নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী মহাভারতে প্রধানতঃ বর্ণিত হয়েছে। হস্তিনাপুরের অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্রকে কৌরব বলা হয়। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে তাঁর ভাই পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হয়েছিলেন। পাণ্ডুর পাঁচটি ছেলেকেই পাণ্ডব বলা হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কৌরবগণ রাজ্য দাবী করলেন। নানা কৌশলে তাঁরা পাণ্ডবদের বনে পাঠালেন। বন থেকে ফিরে এসে তাঁরাও রাজ্য দাবী করলেন। কিন্তু কৌরবগণ কিছুতেই তাঁদের রাজ্য দিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তখন বেঁচেই ছিলেন। তিনি রাজ্যকে দু' ভাগ করে ঝগড়া মেটাতে চাইলেন। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের রাজধানী নিয়ে গেলেন। কিন্তু কৌরবরা এতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা পাশা খেলায় হারিয়ে পাণ্ডবদের আবার তের বছরের জন্য বনে পাঠালেন। বন থেকে ফিরে এসে

পাণ্ডবগণ রাজ্য চাইলেন, এর ফলে যুদ্ধ বেধে গেল। কুরুক্ষেত্রে ১৮ দিন ধরে যুদ্ধ চলল। কৌরবগণ যুদ্ধে হেরে গেলেন। পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে অনেক দিন দেশ শাসন করলেন। তারপর তাঁরা স্বর্গে চলে গেলেন।

দ্বৈপায়ন ব্যাস নামে এক মুনিকে মহাভারতের রচয়িতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু এত বড় বই একজনের লেখা বলে মনে হয় না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়াও এতে আরও অনেক কাহিনী আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি মূল বইএর সাথে এগুলি যোগ করেছেন বলে মনে হয়। মহাকাব্যগুলি থেকে সেই সময়কার দেশের লোকের আচার-ব্যবহার, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জানা যায়।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান: বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যদের ধর্মীয় জীবনে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যাগ-যজ্ঞের নানা রকম জটিল পদ্ধতি সৃষ্টি হয় ও পুরোহিতদের প্রভাব খুব বেড়ে যায়। দেশের সাধারণ লোকের কাছে ওগুলির কোন মূল্য ছিল না। তাছাড়া যাগ-যজ্ঞে অসংখ্য পশু বলির নিষ্ঠুর প্রথা সাধারণ লোকের মনে বিরূপভাবের সৃষ্টি করেছিল। উপনিষদের ঋষিগণ জ্ঞান লাভ করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেছিলেন। অহিংসার উপরও তারা জোর দিয়েছিলেন। ধর্ম কর্মে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও পশু বলির নৃশংসতা থেকে সে সময়কার সমাজে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এর ফলেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই দুই ধর্মের প্রচারকদ্বয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

জৈন ধর্ম: খৃষ্ট পূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই জৈন ধর্মের প্রচার শুরু হয়। কিন্তু খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর এই ধর্মকে নতুন রূপ দান করেন। মজঃফরপুর জেলার বৈশালী গ্রামে মহাবীরের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা দেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল বর্দ্ধমান। যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। ৫১০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। বার বছর নানা জায়গায় ঘুরে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। জিন শব্দের অর্থ হল জ্ঞানী। মহাবীরকেই

জিন বলা হয় ও তাঁর প্রচারিত ধর্ম মতকে জৈন ধর্ম বলা হয়।

মহাবীর নতুন ধর্ম প্রচার করেন নি। তাঁর পূর্বেই এই ধর্মের প্রচারক পার্শ্বনাথ এই ধর্মের চারটি মূল নীতি ঠিক করে দিয়েছিলেন। এগুলি হল—অহিংসা, চুরি না করা, সত্য কথা বলা ও আসক্তি ত্যাগ করা। একে চতুর্যাম বলে। মহাবীর এর সঙ্গে ব্রহ্মচর্য যোগ করে দিয়েছিলেন। জৈনদের মধ্যে আত্মার পবিত্রতা লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। শুধু জ্ঞান লাভ করলেই আত্মা পবিত্র হয় না। ভালভাবে জীবন যাপন করলে আত্মা পবিত্র হয়। এই ধর্মে অহিংসার উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। হাঁটা, চলা, কৃষিকাজ করা প্রভৃতিতে না জেনে অনেক জীব হত্যা হয়। এদের পক্ষে এগুলিও অন্যায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈন ধর্মের অনেক লোক আছে। মহাবীরের উপদেশগুলি প্রথমে মুখে মুখে প্রচার করা হত। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে এগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়।

মহাবীর

বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বুদ্ধ : গৌতম বুদ্ধ বা সিদ্ধার্থ মহাবীরের সময়কার লোক ছিলেন। কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে আনুমানিক ৫৩৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এঁর জন্ম হয়। এঁর পিতা শুদ্ধোধন শাক্য বংশের রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সময়ই তাঁর মা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। বিমাতা ও মাতৃস্বসা গৌতমী তাকে লালন পালন করেন। এর জন্যই তাঁর নাম গৌতম। গৌতম রাজসুখে লালিতপালিত হয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে গোপা নামে এক কুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয় ও ২৯ বছর বয়সে রাহুল নামে এক পুত্রও হয়। বাল্যকাল থেকেই গৌতম সংসারের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায়ও ভাবতেন। ত্রিশ বছর বয়সে

তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও ছয় বৎসর নানা কঠোর ব্রত করে সন্ন্যাস জীবনযাপন ও শাস্ত্র চর্চা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে এইভাবে জীবন যাপন করে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না। এর পর বুদ্ধগয়ার কাছে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসে ৪৯ দিন একাগ্র সাধনা করে জ্ঞান লাভ করেন বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। সারনাথের মৃগবনের কাছে পাঁচজন শিষ্যকে তিনি প্রথমে উপদেশ দান করেন। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি তাঁর উপদেশ প্রচার করে কাটান। ৮০ বছর বয়সে কুশী নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক দিন পরে তাঁর উপদেশগুলি একটি পুস্তকে লেখা হয়েছিল, এর নাম ত্রিপিটক। উপদেশগুলি পালি ভাষায় লেখা। বুদ্ধের উপদেশের মূল কথা হল—সংসার দুঃখে পূর্ণ। এই দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ দূর করার উপায়ও আছে। এই উপায়গুলি জানলে দুঃখ দূর হয়। দুঃখের কারণ হল সুখভোগ করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা বাসনা পূর্ণ হয় না বলেই মানুষ বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে; আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। বাসনা না থাকলে মানুষ মুক্ত হয় অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে। পৃথিবীতে তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করার জন্য তিনি আটটি উপায়ের কথা বলেছেন। এগুলি হলো সৎবাক্য বলা, সৎকর্ম করা, সৎসংকল্প করা, সৎচেষ্টা করা, সৎবিষয় চিন্তা করা, সৎজীবন যাপন করা ও পুরোপুরি সমাধি বা জ্ঞান লাভ করা। একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। এছাড়া ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য

গৌতম বুদ্ধ

ছিল পাঁচটি নিয়ম। একে **পঞ্চশীল** বলা হয়। এগুলি হল—অহিংসা, চুরি না করা, সংযম অভ্যাস করা, সত্য কথা বলা ও বৈরাগ্য। জীবে দয়া ও সকলকে ভালবাসা ও সৎভাবে জীবন যাপনই বৌদ্ধধর্মের মূল কথা। বুদ্ধদেব ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। বেদের প্রাধান্যও স্বীকার করেন নি। জাতিভেদ প্রথাও বৌদ্ধরা মানতেন না। এক সময় ভারতে ও অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ ধর্মের খুব প্রসার হয়েছিল ; কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম বেশী দিন টিকে থাকে নি।

সাম্রাজ্য বিস্তার : মৌর্য সাম্রাজ্য : খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যাবর্তে ষোলটি রাজ্য বা জনপদ গড়ে উঠেছিল। এগুলিকে ষোড়শ জনপদ বলে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বৃজি ও লিচ্ছবি রাজ্য ছিল গণতন্ত্রের শাসনাধীন। রাজার শাসনাধীনে রাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কোশল, মগধ, বৎস ও অবন্তী। এই রাজ্যগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। কিছুদিনের মধ্যে মগধ-রাজ বিম্বিসার অপর রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করেন। এই রাজবংশকে হর্যঙ্ক বংশ বলে।

হর্যঙ্ক বংশ : বিম্বিসার বুদ্ধদেবের সময়কার লোক ছিলেন। এঁর রাজধানী ছিল রাজগৃহ বা রাজগীরে। পিতাকে হত্যা করে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসন দখল করেন। ইনি কোশল, লিচ্ছবি ও মল্লরাজ্য জয় করে রাজ্যের সীমা আরও বাড়িয়েছিলেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ী রাজধানী সরিয়ে পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। এর পর এই রাজ্যের শেষ রাজার মন্ত্রী শিশুনাগ নাগ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সময়েও রাজ্যের আয়তন অনেক বেড়েছিল।

নন্দ বংশ : খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে নন্দবংশের রাজা মহাপদ্ম উগ্রসেন মগধ রাজ্য অধিকার করেন। ইনি খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। ঈক্ষ্বাকু, কুরু, কুমিথিলা, পাঞ্চাল, কাশী প্রভৃতি জয় করে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসের যুগে নন্দবংশের রাজারাই প্রথমে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই নন্দবংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার

যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন মগধের রাজা ছিলেন ধননন্দ। ইনিই এই বংশের শেষ রাজা।

মৌর্যবংশ: এই সময় চন্দ্রগুপ্ত নামে এক বীর গ্রীকদের যুদ্ধকৌশল শিখে এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন; কিন্তু নন্দ রাজাদের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল। কৌটিল্য বা চাণক্য নামে এক বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশের রাজা ধননন্দকে পরাজিত করেন ও মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শীঘ্রই তিনি গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকেও যুদ্ধে হারিয়ে গ্রীক রাজ্যগুলি জয় করেন। তাঁর সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি শুধু বীরই ছিলেন না, রাজ্য শাসনেও খুব দক্ষ ছিলেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস এই সময় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ লিখে গেছেন। কথিত আছে শেষ জীবনে তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর বিন্দুসার রাজা হন। বিন্দুসারের পুত্র অশোক আনুমানিক ২৭৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন। রাজা হয়েই অন্যান্য রাজাদের মত তিনিও কলিঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে বহু লোক হতাহত হয়েছিল। মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে অশোক গভীর বেদনা বোধ করলেন। তিনি আর কখনও যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন না বলে ঠিক করলেন। এই সময় উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। অহিংসা ও প্রেম দিয়ে লোকের মন জয় করাই হল এখন তাঁর কাজ। বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশগুলি শিলালিপিতে লিখে দেশের নানা স্থানে বসিয়ে দিয়েছিলেন; বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য নিজ পুত্র মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠান। অশোক দেশের দেশের নানা স্থানে আরও অনেক প্রচারক পাঠান।

সম্রাট অশোক

শাসনব্যবস্থারও অনেক উন্নতি বিধান করেছিলেন। সমগ্র রাজ্যকে পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করে প্রদেশগুলিকে জেলায় ভাগ করেন।
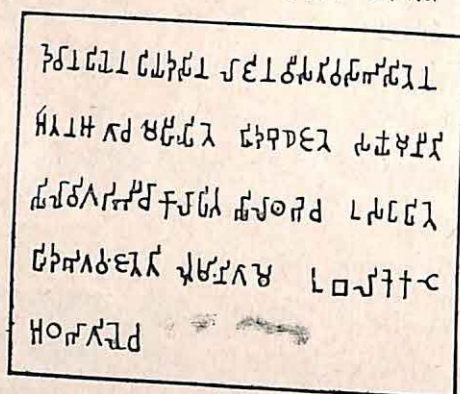
অশোকের শিলালিপি

জেলাগুলি আবার ছোট ছোট গ্রামে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য তিনি উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এইগুলির মধ্যে রাজুক, ধর্মমহামাত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের সর্বত্র তিনি নিজে গিয়ে লোকের অবস্থা দেখে আসতেন। রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য তিনি গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সময়ে জমির উপর ও উৎপন্ন শস্যের উপর কর আদায় করা হত। শিল্পজাত দ্রব্যের উপরও কর ছিল। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে পোনার নদী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রজাদের সন্তানের মত দেখতেন। ইতিহাসে তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়েছে। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁর রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। রাজকর্মচারীদের উপর নির্ভর করেই তিনি রাজ্য শাসন করতেন। দেশের সাধারণ লোকের সাথে শাসনব্যবস্থার কোন সম্পর্ক ছিল না। এইজন্যই বোধ হয় এই বিশাল সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারেনি।

কুশান ও গুপ্ত সাম্রাজ্য: মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রায় দুই শত বৎসর ধরে আর কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারেনি। কোশল-রাজ খরভেল মগধ রাজ্য দখল করে নেন। তাঁর সময়কার একটা শিলালিপি থেকে

জানা যায় যে তাঁর রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় গ্রীক, পহ্লব, শক, হূন ও কুশানগণ ভারতে ছোট ছোট রাজ্য গঠন করেন। বাহ্লিকগণ পাঞ্জাব অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডিমিট্রিয়স ও মিনাণ্ডার। মিনাণ্ডার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে মিলিন্দপনহ্ নাম গ্রহণ করেন। শকগণ তক্ষশীলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন রুদ্রদমন। হূনগণও এই সময় ভারত আক্রমণ করে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে তোলেন।

বিদেশীদের মধ্যে কুশান সাম্রাজ্য সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। কুশানগণ হলেন ইউচি জাতির একটি শাখা। তাঁরা চীনের অধিবাসী ছিলেন। কনিষ্কই ছিলেন কুশানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। সম্ভবতঃ ৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। এই সময় থেকে শকাব্দ গণনা করা হয়। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশোয়ার। কনিষ্কের সাম্রাজ্য কাশ্মীর থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে মত বিরোধ দূর করার জন্য তিনি এক বৌদ্ধ সভার ব্যবস্থা করেন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য নানা স্থানে প্রচারক পাঠান। বুদ্ধচরিত লেখক অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, চিকিৎসাবিদ্ চরক ও সাহিত্যিক বসুবন্ধু তাঁর সময়কার লোক ছিলেন। তাঁর সময় শিল্পকলারও খুব উন্নতি হয়েছিল।

কনিষ্কের ভগ্ন মূর্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্যঃ আনুমানিক ৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মগধের পুরাতন গৌরব ফিরিয়ে আনেন। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও বাংলা-দেশের কতক অংশ জয় করে তিনি রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তও দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। উত্তর ভারতের সমগ্র অংশ জয় করে তিনি নিজ শাসনাধীনে আনেন। দক্ষিণ ভারত, পাঞ্জাব, রাজপুতানা,

নেপাল, সমতট প্রভৃতি রাজ্য জয় করে এখানকার রাজাদের তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। এই অঞ্চলগুলি তিনি নিজে

সমুদ্রগুপ্তের সময়ে স্বর্ণমুদ্রা

শাসন করতেন না। তিনি সুশাসক, বিদ্যোৎসাহী ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিই গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষের কিংবদন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্য তিনিই ছিলেন। বিখ্যাত কবি কালিদাস তাঁর সময়কার লোক ছিলেন। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এই সময় ভারতে আসেন ও তাঁর বিবরণ লেখেন। শকদের পরাজিত করে তিনি 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত ভারতে হূন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। শাসন-ব্যবস্থা, শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতির জন্য গুপ্ত যুগকে

গুপ্তযুগের মূর্তি

ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসের পেরিক্লিসের যুগ ও প্রাচীন রোমের অগাস্টাসের যুগের সাথে এ যুগের তুলনা হয়।

অজন্তার ভাস্কর্য
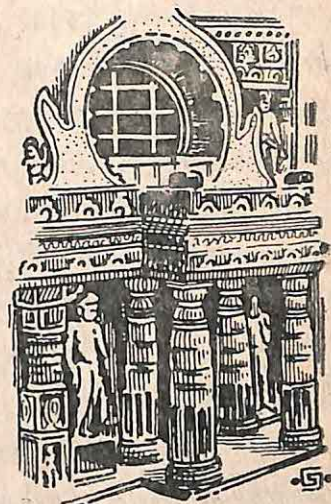
অজন্তার গুহামন্দির

প্রাচীন বাংলা ঃ ভারতবর্ষের মুঘল রাজাদের আমলে উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা—এই সীমানার মধ্যবর্তী স্থানটিকে বাংলাদেশ বলা হতো। বাংলাদেশ নামও সেই সময়কার। বাংলাদেশ এখন দুই ভাগ হয়ে গেছে। পূর্ব বঙ্গ এবং আরও কিছু অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। আমাদের দেশকে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয়।

প্রাচীনকালে সারা বাংলা জুড়ে কোন দেশ ছিল না। বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ় ও গৌড় নামে ছোট ছোট অঞ্চল ছিল অনেক কাল আগে থেকেই। আর্য সভ্যতা এখানে এসেছে অনেক পরে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে একটি প্রাচীন বেদে বাংলাদেশের নাম নেই।

পুস্তকে পুণ্ড্রদের অনার্য ও দস্যু বলা হয়েছে। রামায়ণে বঙ্গকে একটি সমৃদ্ধ জনপদ বলা হয়েছে। মহাভারতে পুণ্ড্র ও বঙ্গ এই দুই জাতির লোককে বলা হয়েছে 'সুজাত' ক্ষত্রিয়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বঙ্গের এক রাজার বীরত্ব কাহিনী উল্লেখ আছে। তিনি কৌরবদের পক্ষে ছিলেন।

প্রাচীন অধিবাসী : বাংলাদেশে অনেক নদ-নদী আছে। এখানকার মাটিও খুব উর্বর। অন্যান্য দেশের মত এখানেও মানুষ বাস করত অতি প্রাচীনকাল থেকেই। পুরাতন প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ পার হয়ে এরাও কৃষিকাজ, পশু পালন প্রভৃতি শিখেছিল এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর্য সভ্যতার সাথে এদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির লোকেরাই এখানকার আদিম অধিবাসী ছিল। এদের বংশধরেরা এখনো আমাদের দেশের অনেক জায়গায় টিঁকে আছে।

আর্যগণ বাংলাদেশে আসার আগেই এখানে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় এক গ্রীক নাবিকের বিবরণ থেকে। এই জাতির নাম ছিল গণ্ডারিডাই। আলেক-জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় এদের এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী ছিল। ঐ বিবরণীতে আর একটি জাতির কথা আছে। তারা হল প্রাসিয়র জাতি। তাদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্রে। সম্ভবতঃ এই দুই জাতি এক রাজার অধীনেই ছিল।

আর্য সভ্যতা বাংলাদেশে আসার পূর্বেই বাঙ্গালী জাতি নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এদের জীবিকা ছিল কৃষি ও পশু পালন। প্রধানতঃ ধান ও আখই এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল। শিল্প কাজের মধ্যে বয়ন শিল্প খুব উন্নতি লাভ করেছিল। কার্পাস ও রেশম উভয় প্রকার বস্ত্রের প্রচলন ছিল। বিখ্যাত মস্‌লিন কাপড় প্রাচীন বাংলার সূক্ষ্ম শিল্পের নমুনা। তাছাড়া পোড়া মাটির কাজ, সোনা ও মণি-মুক্তার কাজ, হাতির দাঁতের কাজও এখানকার প্রাচীন শিল্প ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই

ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। গঙ্গার মোহনায় গাঙ্গে নামক এক বন্দরের কথা লিখেছেন একজন গ্রীক নাবিক। মেদিনীপুর জেলার তমলুক বা তাম্রলিপ্ত নামে এক প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল।

প্রাচীন যুগের বহু ভাঙ্গা মন্দির ও শহর পাওয়া গেছে বাংলার বিভিন্ন স্থানে। এর মধ্যে পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার, দিনাজপুরে বানগড়ের ধ্বংসাবশেষ ও ২৪ পরগণার বেড়াচাপায় চন্দ্রকেতুগড় প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যুগের অনেক নিদর্শন এসব জায়গায় পাওয়া গেছে।

আর্য সভ্যতার প্রসার ঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বাংলাদেশে আর্য সভ্যতার প্রসার আরম্ভ হয়। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত বাংলাদেশ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামে এক রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ৫০৭ খৃষ্টাব্দে সমতট অঞ্চলে বৈন্যগুপ্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর যশোবর্মন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষের দিকে বাংলাদেশের রাজারা স্বাধীন ভাবেই দেশ শাসন করতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। গোপচন্দ্র নামে এক রাজা পশ্চিম বঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের রাজা ছিলেন। এই সময় স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাঙ্কই গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা। গৌড়ের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে। শশাঙ্কের বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে মহাসেন গুপ্তের মহাসামন্ত ছিলেন। উৎকল, কঙ্গোদ, ও মগধ জয় করে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সাথে মিলিত হয়ে তিনি কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মা মৌখরীকে পরাজিত ও নিহত করেন। থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনও তাঁর কাছে হেরে যান। ইতিহাসের যুগে শশাঙ্ক গৌড়ের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। হর্ষবর্ধনও তাঁর রাজ্য জয় করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা তাঁর রাজ্য অধিকার করেন।

বিদেশের সাথে যোগাযোগ : মধ্য এশিয়া : সমাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভাব : প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সাথে অন্যান্য সভ্য দেশের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসী নানা স্থানে উপনিবেশও গড়ে তুলেছিল। অনেক প্রাচীনকাল থেকে রোম সাম্রাজ্য, চীন, গ্রীস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, ব্যাবিলন ও মিশরের সাথে ভারতের যোগাযোগ ছিল।

মধ্য এশিয়া : মধ্য এশিয়া বলতে পূর্ব তুর্কীস্থান বোঝায়। শক, পার্থিয়ান ও কুশান রাজাদের সময় মধ্য এশিয়া বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান পথ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পথেই চীনের সাথেও ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির ফলে ভারতের সমাজ জীবনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সংগঠন বা দল গড়ে তোলেন। ব্যবসায়ীরা শিল্পী নিয়োগ করে বড় বড় প্রতিষ্ঠান চালাতেন। এর ফলে সমাজে মজুর শ্রেণীরও সৃষ্টি হয়েছিল। শিল্পীদের আর নিজের তৈরি মাল বিক্রী করতে হত না। ব্যবসায়ী দলই এদের কাঁচামাল সরবরাহ করতেন ও মজুরী দিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে নিতেন। এদের সমবায় সমিতিও ছিল। বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন দল ছিল। ব্যবসার প্রসারের ফলে এই সময় আর এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। এরা ব্যবসায়ে টাকা খাটাতেন ; এদের শ্রেষ্ঠী বলা হত। সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

বৈদেশিক পর্যটকগণ : মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন—তাঁদের বর্ণিত সমাজ-ব্যবস্থা : মেগাস্থিনিস : গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের কাছে একজন গ্রীক-দূত পাঠান। তাঁর নাম মেগাস্থিনিস। তিনি অনেক দিন ভারতে বাস করেন ও এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ইণ্ডিকা নামে একটি বই লেখেন। এই বই এখন পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা এই বই থেকে সংগ্রহ করে লিখে রেখেছেন।

সামাজিক অবস্থা ঃ মেগাস্থিনিসের সময় ভারতে ছোট-বড় প্রায় একশত রাজ্য ছিল। এগুলির মধ্যে মগধই ছিল প্রধান। মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। রাজধানীর বাড়ীগুলি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। নগর পরিচালনার জন্য ত্রিশজন সভ্য নিয়ে একটি পরিষদ ছিল। দেশের জনসাধারণ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও অমাত্য। ভারতবাসী সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করত। এরা ধর্মানুরাগী ও সত্যবাদী ছিল। অপরাধের দণ্ডবিধান ছিল কঠোর। চুরি ডাকাতি প্রায় হতই না। এখানে দুর্ভিক্ষও হত না। ভারতে দাস-প্রথাও ছিল না। মেগাস্থিনিস এখানকার যে সাতটি জাতি বা শ্রেণীর কথা বলেছেন, সেগুলিকে ঠিক জাতি বলা যায় না। এখানকার সমাজের সাত রকম বৃত্তি বা পেশার লোক ছিল। সম্ভবতঃ এগুলিকে তিনি জাতি মনে করেছিলেন। দাস-প্রথাও যে ভারতে ছিল অন্যান্য পুস্তকে তার প্রমাণ আছে। তবে গ্রীসদেশের মত এখানে দাস-সম্প্রদায় নামে কোন সম্প্রদায় বা জাতি ছিল না।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ও সে সময়ের সামাজিক অবস্থা ঃ চীনদেশের পর্যটক ফা-হিয়েন এদেশে এসেছিলেন গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়। তিনি প্রায় ১৪ বছর (৩৯৯-৪১৪ খৃষ্টাব্দ) এই দেশে ছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দেখা ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি এক বিবরণ লিখেছেন। সে সময় ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। চুরি-ডাকাতি কোথাও হত না। অপরাধীদের শাস্তি বিধানও কঠোর হতো না। প্রজাগণ উৎপন্ন শস্যের একের ছয় ভাগ রাজাকে কর হিসাবে দিত। কর ভার খুব লঘু ছিল। চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল। পাটলিপুত্র খুব সমৃদ্ধ নগর ছিল। অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। চণ্ডালগণ ছাড়া আর কেউ মাংস খেত না। চণ্ডালগণ অস্পৃশ্য ছিল ও নগরের বাহিরে তাদের বাস ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ ধর্ম বিষয়ে খুব

উদার ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশ খুব উন্নত ছিল। তাম্রলিপ্ত একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতিঃ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির চর্চা হতো। বৈদিক যুগে ও তার পর মৌর্য ও গুপ্ত যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভারত বিশেষ ভাবে উন্নতি লাভ করেছিল।

শিল্পকলা ও স্থাপত্যঃ মৌর্য যুগ থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। অশোকের প্রস্তরনির্মিত প্রাসাদ দেখে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। সারনাথ, সাঁচী প্রভৃতি স্থানে অশোক যে স্তূপ ও স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন তার শিল্প-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। সারনাথের সিংহস্তম্ভ ও অশোকচক্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কুশান সম্রাট কনিষ্কও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গ্রীক, পারসিক ও রোমান পদ্ধতির মিলনে এই সময় গান্ধার শিল্পকলা নামে এক নতুন শিল্প পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। গুপ্ত যুগেও ভারতের চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্প খুব উন্নতি লাভ করেছিল। অজন্তা-গুহার চিত্রগুলি গুপ্ত যুগেই আঁকা হয়েছিল। দিল্লীর কাছে চন্দ্ররাজ্যের লৌহ স্তম্ভ এই সময়ের শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতে এই সময় দ্রাবিড় শিল্পকলারও প্রসার ঘটেছিল। কোনারকের সূর্যমন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরগুলিতেও তৎকালীন শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে তৈরি বৌদ্ধমূর্তি ও মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মূর্তিও ভারতীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহিত্যঃ বৈদিক যুগ থেকেই আর্যগণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। দেব-দেবীর স্তব ও বেদের স্তবগুলি সে সময়কার সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। এই সময়ই বেদাঙ্গ ও ষড় দর্শন রচিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাও এই সময়েই রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ও জৈনগণও এই সময় তাঁদের ধর্মসাহিত্য রচনা করেছিলেন।

কুশান সম্রাট কনিষ্কের সময় অশ্বঘোষ বুদ্ধ-চরিত রচনা করেন। নাগার্জুনের লেখা দর্শনশাস্ত্র ও বসুমিত্র নামে একজন সাহিত্যিকের রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রগুপ্তের সময় বসুবন্ধু ও হরিসেন তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় কালিদাস কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য ও শকুন্তলা নাটক রচনা করেছিলেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' ও বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক গুপ্তযুগেই রচিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গ্রন্থগুলিও এই সময়ে নতুন করে প্রকাশ করা হয়েছিল।

শিক্ষা ঃ বৈদিক যুগে আর্যগণ গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। বেদ, উপনিষদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, সঙ্গীত বিদ্যাগুলি সেখানে শেখান হত। তারপর ক্রমশঃ বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। বৌদ্ধ যুগে এই শিক্ষাকেন্দ্র-গুলি আরও বড় হয়েছিল। শিক্ষাকেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে তক্ষশীলা ও নালন্দা প্রধান।

তক্ষশীলা ঃ খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই তক্ষশীলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল। চীন, পারস্য, গ্রীস, গান্ধার ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বহু ছাত্র এখানে লেখাপড়া শিখত। শিক্ষার্থী বা ছাত্রদের এখানেই বাস করতে হত। লেখাপড়ার জন্য কোন খরচ লাগতো না। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি এখানকার পাঠ্য বিষয় ছিল। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ লেখক পাণিনি, কাত্যায়ন, পাতঞ্জলি, চাণক্য, চিকিৎসাবিদ চরক, শুশ্রুত, ও জীবক এখানকার ছাত্র ছিলেন। পরে এদের অনেকে এখানকার শিক্ষকও হয়েছিলেন।

নালন্দা ঃ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পাটনা জেলার বড়গাঁও-এর কাছে অবস্থিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার ছাত্র এখানে এসে লেখাপড়া শিখত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ও আবাসিক ছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রই ছিল এখানকার অধ্যাপনার বিষয়;

কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় ও সাহিত্য প্রভৃতিও এখানে পড়ান হত।

ছাত্রদের থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়া শেখার জন্য কোন খরচ দিতে হত না। পড়াশুনার সুবিধার জন্য পাঠাগার ও খেলাধূলার ব্যবস্থাও এখানে ছিল। লেখাপড়ার শেষে উপাধি দেওয়া হত। শীলভদ্র নামে এক জ্ঞানী বাঙ্গালী কিছুদিন এখানে অধ্যক্ষ ছিলেন।
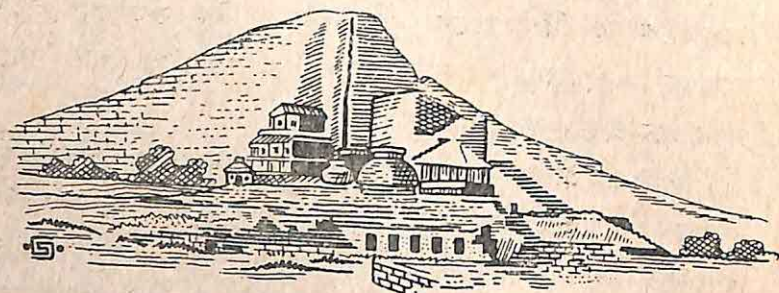
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

বিজ্ঞান: প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা হত। আর্যগণ প্রকৃতির বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করতেন। গুপ্তযুগে আর্যভট্ট ও বরাহমিহির নামে দুইজন জ্যোতিবিদের কথা জানা যায়। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, দিনরাত্রি, বৎসর কেমন করে হয় তা আর্যভট্টই সর্ব প্রথমে পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন। বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' নামে একটি জ্যোতিষের বই রচনা করেছিলেন।

গণিতচর্চাতেও ভারত পৃথিবীতে অগ্রগণ্য ছিল। এক থেকে শূন্যের সাহায্যে রাশি লেখার প্রণালী ভারতেই প্রথমে আবিষ্কৃত হয়েছিল। যজ্ঞবেদী নির্মাণ, মন্দির ও স্তূপ নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে জ্যামিতির প্রভাব দেখা যায়। বীজগণিতও ভারতবাসী চর্চা করত। সোমরস তৈরি, নানা রকম ঔষধ তৈরি করার পদ্ধতি দেখে বোঝা যায় যে ভারতবাসীর মধ্যে রসায়নেব চর্চা প্রচলিত ছিল।

চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা আর্য যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। আয়ুর্বেদ আর্যদের পাঠ্য বিষয় ছিল। অথর্ব বেদে নানা প্রকার

গাছপালার বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা লেখা আছে। চরক ও শুশ্রুত নামে দুইজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য গুপ্তযুগেই তাঁদের বই লিখেছিলেন। দেশবিদেশে এই বইগুলি অতুলনীয় বলে গৃহীত হয়েছে। জীবক নামে একজন চিকিৎসকের নামও উল্লেখযোগ্য। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ পাঠ্য বিষয় ছিল।

অনুশীলনী

১। ভারতে আর্যদের আগমন কখন ঘটেছিল? আর্যগণ প্রথমে ভারতের কোন্ অংশে বসবাস শুরু করেন? তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা কর।

২। বেদ কি? বেদ কখন রচিত হয়? বেদের বিভিন্ন ভাগের বিষয় যা জান লিখ।

৩। বৈদিক যুগের সমাজের বৈশিষ্ট্য কি? এই যুগের সমাজ, বর্ণাশ্রম, জীবিকা ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। চতুরাশ্রম বলতে কি বুঝ? আর্যরা কিভাবে এই চতুরাশ্রমকে জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন?

৫। মহাকাব্য কাকে বলে? আমাদের দেশে কি কি মহাকাব্য রচিত হয়েছে? এগুলি কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর রচিত?

৬। মহাভারতের প্রধান বক্তব্য বিষয় কি? এই মহাকাব্য পাঠ করে আমরা কি জানতে পারি?

৭। রামায়ণ কে রচনা করেছিলেন? কি বিষয় নিয়ে রামায়ণ রচনা করা হয়েছে?

৮। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান সম্পর্কে যা জান লিখ।

৯। জৈন ধর্মের প্রবর্তক কে? এই ধর্মের প্রধান মতগুলি কি?

১০। বৌদ্ধ ধর্ম কে প্রচার করেছিলেন? মানুষের প্রতি তাঁর কি কি উপদেশ ছিল? সেগুলি সংক্ষেপে বল।

১১। মৌর্য সাম্রাজ্য কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে? মৌর্য বংশ ও রাজ-রাজড়াদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১২। কুশান সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন? কুশান কারা ছিল? কুশান সম্রাটদের রাজ্য বিস্তার ও শাসন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৩। গুপ্ত সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তার লাভ করে? এই সাম্রাজ্যের কোন্ রাজা সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে যা জান বল।

১৪। গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? গুপ্তযুগের পতন পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ঐতিহাসিক বিবরণ দাও।

১৫। ভারতীয় সমাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর মধ্য এশিয়ার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৬। মেগাস্থিনিস কখন ভারতে এসেছিলেন? তার বিবরণ হতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি?

১৭। ফা-হিয়েনের বিবরণ হতে আমরা সেদিনের ভারতের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কি জানতে পারি?

১৮। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল? তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের শিক্ষা দান করা হত?

১৯। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা ও স্থাপত্য সম্পর্কে যা জান লিখ।

২০। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি বিষয়ে আলোচনা কর।

২১। সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর:
- (ক) সপ্তসিন্ধু কোথায় ছিল?
- (খ) আর্যাবর্ত কাকে বলে?
- (গ) বর্ণাশ্রম কি? কোন্ সময় এর সৃষ্টি হয়েছিল?
- (ঘ) চতুরাশ্রম সম্পর্কে কি জান?
- (ঙ) জৈন ধর্মের উপদেশ কি কি?
- (চ) পঞ্চশীল কি? এর উদ্দেশ্যই বা কি?
- (ছ) কে ও কখন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?
- (জ) মেগাস্থিনিস কে ছিলেন? তিনি কি করেছিলেন?

২২। সঠিক উত্তরের পাশে √ চিহ্ন বসাও:
- (ক) আর্যরা ভারতে এসেছিলেন——হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে/ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে।
- (খ) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম——রামায়ণ/বেদ।
- (গ) বৈদিক যুগে আর্যগণ বাস করতেন——গ্রামে/বনে।
- (ঘ) মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন—বৈশালী গ্রামে/লুম্বিনী গ্রামে।
- (ঙ) বিম্বিসারের রাজধানী ছিল——রাজগীরে/তক্ষশীলায়।

২৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:
- (ক) অনার্যদের সাথে——ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল।
- (খ) সমগ্র বেদ——ভাগে বিভক্ত।
- (গ) সোমরস হল এক ধরনের——রস।
- (ঘ) সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন——।
- (ঙ) 'জিন' শব্দের অর্থ হল——।
- (চ) কপিলাবস্তুর——গ্রামে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়।
- (ছ) চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর——রাজা হন।
- (জ) মগধের রাজধানী ছিল——।

———